দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৮ বর্ষ, ১৭ সংখ্যা।। ২২ ডিসেম্বর, ২০২৫।। ৬ পৌষ, ১৪৩২।। যুগাব্দ - ৫১২৭।। website : www.eswastika.com

ভারতে জেহাদের বীজ নির্মূল করতে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন
— পৃঃ ১৩

পশ্চিমবঙ্গে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস ভবিষ্যতের অশনি সংকেত

কুটুম্ব প্রবোধন → লক্ষ্য

যৌথ পরিবার

সংগঠিত পরিবার

সশক্ত পরিবার

সুস্থ পরিবার

সুরক্ষিত পরিবার

সমর্থ পরিবার

সম্পন্ন পরিবার

সুসংস্কৃত পরিবার

সমৃদ্ধ পরিবার

ব্যবস্থিত পরিবার

প্রভাবশালী পরিবার

আদর্শ পরিবার

প্রতিষ্ঠিত পরিবার

সন্তুষ্ট পরিবার

সুখী পরিবার

আনন্দিত পরিবার

আপনার এলাকায় কুটুম্ব প্রবোধন গতিবিধির কেন্দ্র খুলতে চাইলে
এই নম্বরে যোগাযোগ করুন— ৯৮৩৬৪৪৫৫২২ (9836445522)

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৮ বর্ষ ১৭ সংখ্যা, ৬ পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

২২ ডিসেম্বর - ২০২৫, যুগাব্দ - ৫১২৭,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ভাবনা ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2025-2027

R N I Regd. No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন-এর পক্ষে প্রকাশক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত। মুদ্রক প্রশান্ত কুমার হাজরা।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

কেলেঙ্কারিতে মশগুল শাসক, তাই 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই' : হয় না যেটা সেটাও হবে ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

মেসিতে কয়লার কালি ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

মাওবাদকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হলে এর বৌদ্ধিক ভিতকেও ধ্বংস করতে হবে ◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ৮

পশ্চিমবঙ্গে 'বাবরি মসজিদ' ভবিষ্যতের অশনি সংকেত বহন করছে ◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১১

ভারতে জেহাদের বীজ নির্মূল করতে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন ◻ অর্ণব কুমার দে ◻ ১৩

বাবরির শিলান্যাস— 'পুতনার' ছলনায় বাঙ্গালি আর ভুলবে না ◻ শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী ◻ ১৫

স্বস্তিকা পত্রিকার গোড়ার কথা ◻ ড. পঙ্কজ কুমার রায় ◻ ১৭

ভারতীয় মেয়েরা আজ হয়ে উঠেছে 'অপরাজিতা' ◻ অজয় ভট্টাচার্য ◻ ১৮

পশ্চিমবঙ্গে আজ ভাতা, বিজ্ঞাপন আর ভাঙ্গাচোরা অর্থনীতি ◻ সোমনাথ গোস্বামী ◻ ২০

বাবরি মসজিদের শিলান্যাস এই রাজ্যের জন্য ভয়াবহ হতে চলেছে ◻ তারক সাহা ◻ ২৩

নিম্বার্ক দর্শনে অহিংসা এবং ধর্মরক্ষার অনুসন্ধান ◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ◻ ৩১

সংবাদপত্রে মুক্ত ভাষার কাণ্ডারি স্বামীনাথন সদানন্দ ◻ কৌশিক রায় ◻ ৩৪

বিজয় দিবস : ১৯৭১ সালে ভারতের বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ◻ কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য ◻ ৩৬

কেমন আছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা? ◻ অমলেশ মিশ্র ◻ ৩৭

রাজ্য ভলিবল সংস্থায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা ◻ নিলয় সামন্ত ◻ ৩৯

'সঙ্ঘ' মানে সম্ভব ◻ দুর্গাপদ ঘোষ ◻ ৪৩

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে বিষাক্ত হতে পারে জেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ◻ ড. বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ৪৬

মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ কি ইসলামি আবেগ না কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা? ◻ কৌটিল্য ◻ ৪৮

'খেলা হবে'র খেলায় হেরে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ ◻ বিপ্লব বিকাশ ◻ ৪৯

গল্পকথায় ডাক্তারজী : সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস ◻ ৫০

নিয়মিত বিভাগ :

◻ চিঠিপত্র : ১৯ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ : সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৫-৩০ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻

প্রকাশিত হবে
২৯ ডিসেম্বর
২০২৫

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

জগদ্গুরু যখন কল্পতরু

খ্রিস্টীয় ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিতে কিছু মানুষ উদ্দামতা ও হইহুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে 'নিউ ইয়ার' উদ্‌যাপনে মেতে ওঠেন। কিন্তু এটি প্রকৃতপক্ষে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্মরণ-মননের দিন। ১৮৮৬ সালের এই দিনটিতে অপার লীলাময় শ্রীশ্রীঠাকুর কল্পতরু হয়ে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর দিব্য স্বরূপ এবং ভক্তদের মাধ্যমে সমগ্র বাঙ্গালি জাতিকে দিয়েছিলেন চৈতন্যোদয়ের বার্তা। সনাতনী বাঙ্গালিরা এই দিনটিকে 'কল্পতরু দিবস' হিসেবে অতিবাহিত করে থাকে।

স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় কল্পতরু দিবসের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

প্রকাশিত হবে
২৯ ডিসেম্বর
২০২৫

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market**

Kolkata-700 006

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার বার্ষিক গ্রাহকদের প্রতি সপ্তাহে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ২১০০্ টাকা (মোট ২৮০০) টাকা পাঠাতে হবে।

যে সকল গ্রাহক প্রতি মাসের পত্রিকা (৪/৫টি) একত্রে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে নিতে ইচ্ছুক তাদের গ্রাহক মূল্য ৭০০্ টাকা এবং রেজিস্ট্রি খরচ ৫৫০্ টাকা (মোট ১২৫০ টাকা) পাঠাতে হবে।

যোগাযোগ : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫ ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেক Subhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693 IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

বিতর্কিত নামকরণ কেন?

৭১২ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভূখণ্ডে সংঘটিত হয় প্রথম মুসলমান আক্রমণ। আরব সাম্রাজ্যবাদের অধীনস্থ হয় তৎকালীন সিন্ধুপ্রদেশ। এরপর ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশে বহু শতাব্দী যাবৎ সংঘটিত হইয়াছে তুর্কি, আফগান, মুঘল ও পারসীক আক্রমণ। ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ প্রান্তে কায়েম হইয়াছে মুসলমান শাসন। ইহার দরুন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে অসংখ্য মঠ ও মন্দির। গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় সোমনাথ মন্দির। তুর্কি ও আফগান শাসনের পরবর্তী পর্যায়ে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করে উজবেকিস্তানের ফারগানা হইতে আগত জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। এই বহিরাগত, আক্রমণকারী ভারতবর্ষের কিয়দংশে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠা করে। মধ্য এশিয়া হইতে আগত বাবরের নির্দেশে তাহার সেনাধ্যক্ষ ও মুঘল সৈন্য অপবিত্র করে অযোধ্যা, ধ্বংস করে শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির। পরবর্তী মুঘল শাসকদের দীর্ঘ অপশাসনে ভারতবর্ষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় প্রায় সহস্রাধিক মঠ-মন্দির; মথুরা শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি ও কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরও তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। ভারতবর্ষে বারংবার ইসলামি আক্রমণ সংঘটিত হইলেও বামপন্থী ইতিহাসবিদগণ তাহা সযত্নে এড়াইয়া গিয়াছেন। তাহাদের রচিত ইতিহাসে অত্যাচারী, নির্মম, নৃশংস মুসলমান শাসকদের 'মহান' প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সত্য হইল, ভয়াবহ ইসলামি শাসনে ভারতবর্ষে ধর্ম সংকটাপন্ন হইয়াছে, মঠ-মন্দির ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, হিন্দু নারীদিগের সম্ভ্রমহানি হইয়াছে এবং দেশ জুড়িয়া ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে ধর্মান্তরণ।

দুঃসহ ইসলামি শাসনের অবসানের পর ইংরাজ শাসনেও নিপীড়িত, অত্যাচারিত হইতে থাকে ভারতবাসী। ভারত শাসনের ক্ষেত্রে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি প্রণয়ন করিয়া ইংরাজ প্রশাসন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রচ্ছন্ন মদতদানের দ্বারা অব্যাহত থাকে হিন্দু নির্যাতন। ভারত সভা ও হিন্দু মহাসভা গঠনের পরবর্তী পর্যায়ে কংগ্রেস, মুসলিম লিগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ইংরাজ মস্তিষ্কপ্রসূত। ইংরাজ অনুধাবন করে যে, ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই এদেশের যাবতীয় মঙ্গল কামনা করে; ইংরাজ বিতাড়নের মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করিতেও তাঁহারাই তৎপর। ইহার বিপ্রতীপে ইসলামি শাসনামল হইতেই মুসলমানদের লক্ষ্য কাফের নিধন এবং দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠা। এই কারণে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হিন্দুদিগকে পরাধীন রাখিতে মুসলমান শক্তিকে সুকৌশলে ব্যবহার করিবার নীতি অব্যাহত রাখে ইংরাজ প্রশাসন। বিষাক্ত, সাম্প্রদায়িক জেহাদি শক্তিকে ক্রমাগত ইন্ধন দান করিয়াছে ইংরাজ শাসকগণ। ইংরাজ শাসনামলেই মোপলা, কলিকাতা ও নোয়াখালিতে সংঘটিত হয় ভয়াবহ হিন্দু নরসংহার। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে'-র সাক্ষী থাকে সমগ্র কলিকাতা শহর।

'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর মাধ্যমে মুসলিম লিগের লক্ষ্য ছিল ভারত বিভাজন ও 'পাকিস্তান' আদায়। ১৯৪৭ সালে স্বীয় লক্ষ্যপূরণে সক্ষম হয় মুসলিম লিগ। ভারতের হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্বে লাভবান হয় ইংরাজ নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তিও। দেশ বিভাজনের ফলে অঙ্গচ্ছেদ ঘটে ভারত জননীর। বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাকিস্তানের অধীনস্থ হয়। ১৯৪৭-পরবর্তী অধ্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানে পরিণত হয় পূর্ববঙ্গ। পূর্ব পাকিস্তান জুড়িয়া অব্যাহত থাকে ভয়াবহ হিন্দু নির্যাতন। যদিও স্বাধীনতা পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ পাকিস্তানের অধীনে থাকিবে বলিয়া দাবি করে মুসলিম লিগ। তাহাদের এহেন প্রস্তাবকে সমর্থন দান করে কমিউনিস্ট পার্টি। এই প্রস্তাবকে নস্যাৎ করিয়া প্রস্তাবিত পাকিস্তান বিভাজনপূর্বক এক খণ্ড 'পশ্চিমবঙ্গ' উদ্ধারে সক্ষম হন ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ভারতের বুকে হিন্দু বাঙ্গালি সন্ধান পায় নিজস্ব একটি বাসস্থান বা হোমল্যান্ডের। কিন্তু ১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে কালচক্রের সম্মুখগতির সঙ্গে নানাবিধ বিপর্যয়ের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ ক্রমশ ঘনীভূত হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্যাকাশে। ভূমি সংস্কারের কোপে পড়িয়া কৃষিজমির অধিকার হারায় হিন্দুরা। একদা সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ অধিকার করিবার স্বপ্নে মাতোয়ারা জেহাদিরা হইয়া ওঠে সেকুলার রাজনৈতিক দলগুলির নিশ্চিন্ত ভোটব্যাংক। পূর্ব পাকিস্তান, পরবর্তীকালে বাংলাদেশ হইতে চলিতে থাকে ব্যাপক অনুপ্রবেশ। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাসমূহে অব্যাহত থাকে জমি-জেহাদ। ইহার পরিণামে গত আট দশকে রাজ্য জুড়িয়া ধীরে ধীরে জনবিন্যাস পরিবর্তিত হইয়াছে। জনবিন্যাসের ভারসাম্য পরিবর্তিত হওয়ায় বর্তমানে বিভিন্ন জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘু শ্রেণীতে পর্যবসিত হইয়াছে। কংগ্রেস ও বামপন্থী শাসনে পশ্চিমবঙ্গে জেলাস্তরে মুসলমান রাজনৈতিক নেতৃত্বের আবির্ভাব না ঘটিলেও বর্তমান শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রীর অনুপ্রেরণায় রাজ্য জুড়িয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে মুসলমান নেতৃত্ব। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের বিভিন্ন জেহাদি সংগঠনের সহিত গোপন সংশ্রব থাকা এই নেতৃত্বের স্বপ্ন হইল— 'বৃহত্তর ইসলামিক বাংলা'। জিন্না ও সোহরাওয়ার্দির ব্যর্থ স্বপ্নপূরণে তৎপর হইয়াছে এই জেহাদি নেতৃত্ব। ১৯৯২ সালে অযোধ্যা হইতে সেই কলঙ্কিত ধাঁচা অপসারিত হইলেও, ২০২৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় বহিরাগত, আক্রমণকারী বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে আসীন হইয়াছেন হুমায়ুন কবির। বিতর্কিত নামকরণ-সম্পন্ন মসজিদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বিপুল অর্থসম্পদ ইতিমধ্যেই তাহার হস্তগত হইয়াছে বলিয়া সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে। ২২ ডিসেম্বর একটি প্রকাশ্য সভার মাধ্যমে একটি নূতন রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করিলেও সম্প্রতি বহরমপুর শহরের পরিবর্তে কোনো বিকল্প স্থানে সেই সভা আয়োজনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তিনি। এইসবের পশ্চাতে পরোক্ষ মদত রহিয়াছে রাজ্যের শাসক দলের সর্বোচ্চ নেত্রী তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। আট দশক ধরিয়া সেকুলার রাজনীতিকদের সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পের প্রভাবে বহিরাগত, আক্রমণকারীর ইতিহাস মুছিয়া ফেলিবার পরিবর্তে সেই চরিত্রটিকেই তাহাদের পূর্বপুরুষ জ্ঞান করিতেছে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়। সাম্প্রতিক অতীতেও বিভিন্ন ঘটনায় রাজ্যব্যাপী জেহাদি শক্তির তাণ্ডব ও প্রবল প্রতাপ প্রত্যক্ষ করিয়াছে রাজ্যবাসী। এহেন পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সম্মুখে একটি কঠিন পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। বিশ্রুত হইলে চলিবে না সনাতন ধর্মের শাশ্বত বাণী— 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। অর্থাৎ ধর্মের শরণাপন্ন হইলে, ধর্ম রক্ষায় সকলে তৎপর হইলে ধর্মই সকলকে সুরক্ষা প্রদান করিয়া থাকে। ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাষ্ট্রবাদী রাজনৈতিক শক্তি জয়যুক্ত হইলেই একমাত্র দেশবিরোধী, জেহাদি শক্তির সমূলে বিনাশ সম্ভব। জেহাদি ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে এবং রাজ্য রক্ষার্থে আপামর পশ্চিমবঙ্গবাসীর রাজনৈতিক সচেতনতা, সার্বিক জাগরণ ও একত্রীকরণ তাই সময়ের দাবি।

সুভাষিতম্

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।

বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ২।৫৬।)

অর্থ ঃ দুঃখে অনুদ্বিগ্ন চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন এবং আসক্তি, ভয় এবং ক্রোধ রহিত মুনিকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

কেলেঙ্কারিতে মশগুল শাসক, তাই 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই'

হয় না যেটা সেটাও হবে

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

কেলেঙ্কারির মধ্যেই তৃণমূলের জন্ম। বিদেশি বামেদের ফেলে রাখা কাদা গায়ে মেখে তৃণমূল তৈরি হয়। সে কাদা সরাতে গিয়ে ক্ষমতায় আসার দু'বছরের মধ্যেই তারা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সেটাই শুরু। ২০২৬-এর ভোটে হয়তো তার শেষ হতে চলেছে। না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সরকারের শেষ বেলায় কিংবদন্তি ফুটবলার লিওনেল মেসি-কে নিয়ে যে কেলেঙ্কারি তৃণমূল করল তা তাদের পক্ষেই সম্ভব। এর আগে ২০১১ সালের ৩১ আগস্ট মেসি কলকাতায় আসেন। একই সরকারের দুটি আলাদা মুখের পার্থক্য বোঝার কথা তাঁর নয়। কিন্তু গতবারের অভিজ্ঞতার স্মৃতির সঙ্গে এবারের অসভ্যতার ফারাক নিশ্চয় বুঝেছেন। তাঁর কাঁধে একজন ভারী মন্ত্রী ঝুলে পড়েছিলেন; তখন সেই মন্ত্রীকে দেখতে কতটা নির্লজ্জ লেগেছিল তা বোঝার ক্ষমতা সে মন্ত্রীর থাকার কথা নয়। রাজ্যের মানুষ তা দেখেছেন।

২০২৩ সালে 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন মেসি নন' বলে একটি রূপক লেখা রাজ্যপাটে প্রকাশিত হয়। তাতে বোঝানো হয় রাজ্যে ভোটে জেতার খেলায় তৃণমূলনেত্রী কীভাবে প্রতিদিন বিজেপি-র তুলনায় পিছিয়ে পড়ছেন। দুর্নীতি আর কেলেঙ্কারির সূতিকাতে তৃণমূলের জন্ম। তৃণমূলের সুবিধা তারা কোনো চিন্তাশীল বা নীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দল নয়। অনেকটা রাজীব, সোনিয়া, রাহুল গান্ধী আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা দু'টি নেতার ক্লাব। ভারত আক্রমণকারী বাবরের উত্তরসূরী তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় তিনি বাবরি ধাঁচা বানাতে চান। বন্দেমাতরম্ ঘিরে মুসলমানবাদী জওহরলাল নেহরু ১৯৩৭ সালে ন্যক্কারজনক খেলা খেলেছিলেন। আট শতাব্দী পরে পুরোনো মুসলিম লিগের নতুন জন্ম দিতে উঠে পড়ে লেগেছে কবির। প্রাবন্ধিক নীরদ চৌধুরী লিখেছিলেন, 'নেহরু হিন্দু বিরোধী ছিলেন। যা কিছু হিন্দু তাতেই তিনি অনাকৃষ্ট হতেন।'।

রাজ্যের মুসলমানদের তৃণমূলের ঘর থেকে বের করে তাদের নিজেদের ঘর তৈরি করে দেওয়ার চেষ্টা করছে কবির। এতে নিজেদের মুসলমান ভোটব্যাংক বাঁচাতে আরও তৎপর হয়ে উঠে রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরোধিতার লাইন নিতে হয়তো বাধ্য হবে তৃণমূল কংগ্রেস। হিন্দুদের গন্দা ধর্ম বলার পরেও তৃণমূল নেত্রী কেন পার পেয়ে যান তার বড়ো প্রমাণ হুমায়ুনের মতো সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা। উত্তরপ্রদেশের বিতর্কিত সৌধ দীর্ঘ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অপসারিত হয়। কলঙ্কিত ধাঁচার সেই মিথ্যার প্রাচীর নতুন করে গড়তে চাইছে হুমায়ুন। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের বিরুদ্ধে জেহাদি মানসিকতাকে জাগিয়ে তোলাই হুমায়ুনের কাজ। তাতে তৃণমূলের সুবিধা। আর তা করতেই রাস্তায় নেমেছে হুমায়ুন। যদিও সামনে দাবি করছে হিন্দু দল হিসেবে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী তার কাছে মমতার থেকে ঢের বেশি কাম্য। অর্থাৎ মুখে মধু মনে বিষ। ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা ভোটে হিন্দু একতা নতুন মাত্রা পেতে চলেছে। ইসলামবাদী তৃণমূল তা ভালোই বুঝেছে। ফলে হিন্দু বিরোধিতাকে চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে দিতে বাবরির মতো একটি মিথ্যা কাঠামোর নামাবলী গায়ে চড়িয়ে হুমায়ুনদের রাস্তায় নামানো হয়েছে। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে ডেবরার বিধায়ক, একদা পুলিশ আমলা হুমায়ুন কবিরের একই পদক্ষেপ সন্দেহের উদ্রেক করে।

প্রশ্ন জাগতেই পারে হঠাৎ করে দুই 'দুধেল গাই' বিধায়ক একসঙ্গে তৃণমূল বিরোধী হয়ে উঠল। এবারের আসন্ন ভোটে তৃণমূলের মুসলমান ভোট ভাঙবে বলে একটি কথা বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। তাতে তৃণমূলের পরামর্শদাতারা এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চাইছে। তারা মনে করছে তাতে তাদের প্রধান শত্রু বিজেপি খানিকটা গা-ছাড়া ভাব দিয়ে লড়াইয়ে নামবে। কারণ প্রথমত, তৃণমূলের মুসলমান ভোট ব্যাংকে হাত পড়লে বিজেপির জয় নিশ্চিত। দ্বিতীয়ত, তৃণমূলের পরামর্শদাতারা হয়তো ভাবছে, এতে মুসলমানরা ক্ষেপে গিয়ে আরও বেশি করে বিজেপির বিরুদ্ধে তৃণমূলকে ভোট দেবে। সর্বভারতীয় দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দল হিসেবে বিজেপি যে সে ফাঁদে পা দেবে না তা ধরে নিলেও বলা যায় না শেষ পর্যন্ত মমতার দল আর কোন কোন কেলেঙ্কারিতে নিজেদের জড়িয়ে নিয়ে রাজ্যের মানুষকে আবার নতুন করে ভুল বোঝাবে। তৃণমূলের শেষ প্রহর বলে যে ধারণা চালু হয়েছে তা অমূলক না হলেও বলতে বাধা নেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যতক্ষণ না তাদের রাজনৈতিক সচেতনতায় নতুন করে শান দিয়ে সরকার পরিবর্তনের কথা ভাবছে ততক্ষণ পর্যন্ত বলা চলে না আঁচালে বিশ্বাস নেই। তবে এবার, হয় না যেটা, সেটাও হবে। রাজনীতির পাশা খেলায় আপাতত বিজেপি এগিয়ে। তবে কপটের ছলের অভাব নেই তাই পরম্পরাগত রাজনৈতিক ধৈর্য বজায় রাখতেই হবে।

(লেখকের মতামত ব্যক্তিগত)

মেসিতে কয়লার কালি

সর্ব কেলেঙ্কারিষু দিদি,

মাপ করবেন দিদি। আর পারলাম না। আমি খুবই আহত। মেসি নন, মেসির অনুষ্ঠানেও কয়লা কেলেঙ্কারির ছায়া। ভাবা যায় দিদি! আর কত সহ্য করা যায় বলুন তো! ভাবতে অবাক লাগছে যে, কয়লার টাকা ঢুকে গিয়েছে এই গর্বের সরি লজ্জার মেসি সফরে।

মেসিকাণ্ডের কথা লেখার আগে একবার জানিয়ে রাখি দিদি, খসড়া তালিকায় কিন্তু নাম নেই ৫৮.২ লাখের। শুনানিতে ডাক পাবেন ১ কোটি ৬৬ লাখ। দুই মিলিয়ে আপনার দলে তো কান্নার রোল শুনছি। আরও যেটা শুনছি, তাতে এটা সবে সকাল। ব্রেকফাস্ট হবে, তার পরে লাঞ্চ হবে, বিকেলে চা খাবে, তার পরে ডিনার। আরও কষ্ট অপেক্ষা করে রয়েছে।

দিদি, এবার মেসি এবং কয়লা ভাইপোর কথা বলি। আপনি সবই জানেন। মাত্র ১৬ মিনিটেই মাঠ ছাড়তে হয় মেসিদের। ১০-১২ হাজার টাকার টিকিট কাটা সত্ত্বেও মেসিকে গ্যালারি থেকে দেখা যায়নি। নেতা-মন্ত্রী, আয়োজক কর্তাব্যক্তিরা ঘিরে রেখেছিলেন। ভারতের অন্য দুই রাজ্যে নির্বিঘ্নে সবটা হলেও কলকাতায় হয়নি। কারণ, কাটমানি আর কালো টাকা সাদা করার খেলা ছিল এটা। আপনার পরিবারের লোকেরাও ছবি তুলতে গিয়ে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। মেসির সতীর্থ লুইস সুয়ারেজের পেটে কনুইয়ের গুঁতো লাগে। হাতে নখের আঁচড় লাগে রদ্রিগো ডি'পলের। এর পরেই মেসিদের বার করে নিয়ে যান নিরাপত্তারক্ষীরা। এর পর ক্রুদ্ধ জনতা যুবভারতীতে ভাঙচুর চালায়। চেয়ার উপড়ে ছোঁড়া হয় মাঠে। হাজারো মানুষ মাঠের ভিতরে ঢুকে পড়েন। পুলিশকে তাড়া করেন। পরিস্থিতি সামাল দিতে এক ঘণ্টার বেশি সময় লেগেছিল। এখন কারা ভাঙচুর করেছে ভিডিয়ো দেখে দেখে গ্রেফতার চলছে।

কিন্তু দিদি, খেলার মাঠে ভাঙচুরের চেয়ে লজ্জার কাজ গণতন্ত্রের মন্দির বিধানসভা ভাঙচুর করেছিলেন আপনারা। ২০০৬ সালের ৩০ নভেম্বর। সেদিন সিঙ্গুরে আপনাকে পুলিশ নাকি ঢুকতে দেয়নি বলে আপনি সোজা চলে আসেন রাজ্য বিধানসভায়। হাতে ছিল নীল রেক্সিনে মোড়া ভারতীয় সংবিধান। তার পরে কী হয়েছিল? মনে আছে দিদি! কেউ কি গ্রেফতার হবে নাকি সেই ভিডিয়ো দেখে!

যুবভারতীর ঘটনার তদন্তের জন্য আপনি যে কমিটি গড়েছেন, সেই কমিটি কিন্তু চমক দিয়েছে দিদি! এত অল্প সময়ের মধ্যে তদন্ত করে রিপোর্ট দিয়েছে এই কমিটি, এটাও আপনার রাজত্বকালে নির্বাচনী প্রচারের মাইলস্টোন হিসাবে কাজে লাগবে। রাজ্য পুলিশের কর্তা রাজীব কুমার-সহ আরও কয়েকজন পুলিশ কর্তাকে শো-কজ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, কয়েকজন অধস্তন পুলিশকর্তাকে নিয়ে সিট গঠন করা হয়েছে ঊর্ধ্বতন এই কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার জন্য। বিষয়টা কি হাস্যকর নয় দিদি! রাজ্যের মানুষ সন্দেহ প্রকাশ করছে, অধস্তন কর্তাদের দিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার এই নাকটবাজি নিয়ে। প্রশ্ন তুলেছেন দিদি, তাঁরা কি তাঁদের কর্তাদের দোষ খুঁজে পাবেন! না সাহস দেখাতে পারবেন! এদিকে আবার অরূপবাবু ক্রীড়া মন্ত্রিত্ব থেকে পদত্যাগ করে আপনাকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছেন। মানুষ আড়ালে আবডালে জানতে চাইছে, পুলিশ মন্ত্রী হিসাবে আপনার পদত্যাগ হলো না কেন? কী সাহস বলুন তো দিদি এদের! মানুষ কিন্তু বুঝতে পেরেছে দিদি, এসবই নির্বাচনের আগে মানুষকে বোকা বানানোর খেলা। অশান্ত ফুটবলপ্রেমীদের ললিপপ দিয়ে শান্ত করার চেষ্টা। যাই হোক ও সব ঠিক হয়ে যাবে দিদি, ক'দিন বাদেই মানুষ এসব ঠিক ভুলে যাবে। আর এখন তো সবাই ব্যস্ত নিজের নামটা ভোটার তালিকায় খুঁজে পেতে।

এবার কয়লা ভাইপোর কাণ্ড। কয়লা পাচারের মূল পাণ্ডা বিনয় মিশ্র তো আপনার ভাইপোর খুবই ঘনিষ্ঠ এবং ভরসার। তিনি যখন তৃণমূলের যুব সভাপতি হন তখন বিনয়কে গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সম্পাদকের পদ দেন। এখন দেশ থেকে পালিয়ে তিনি নাম বদলে নাকি দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্র ভানুয়াটুতে থাকেন। আজ না হয় কাল তাকে ভারতে আনা হবেই। সেই বিনয় মিশ্র অত দূরে বসে কলকাতায় মেসির অনুষ্ঠানে টাকা ঢাললেন। মেসির অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পত্র। সনকা বলে একটি কোম্পানি। আবার দেখুন সনকা হাসপাতাল। এখন এর দুই ডিরেক্টর তপনকুমার পোবি এবং পার্থ পোবি। দিদি আপনি ভালোই জানেন, এই পোবিরা আসলে ছদ্ম ডিরেক্টর। প্রাক্তন ডিরেক্টর বিনয় মিশ্রই এখনও আসল। এই কোম্পানিটার জন্ম কিন্তু ২০১১ সালে। এটা জানার পরে আমি বুঝেছি, ওইদিন কেন মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল বা মহামেডানের নয়, উড়ে এসে জুড়ে বসা আপনার ভাইপোর ক্লাব ডায়মণ্ড হারবার এফসি-র খেলা ছিল! ২০ টাকার জল ২০০ টাকায় বিক্রিতেও তিনি রয়েছেন কিনা কে জানে!

দিদি, পরিস্থিতি যা তাতে আমি জানি না, ভোট পর্যন্ত আপনার সঙ্গ দিতে পারবো কি না! তবে এটা ঠিক যে এখনও আপনার প্রতি আমার করুণা হচ্ছে। এত দুর্নীতি করা যায়! একটা কোনো জায়গাও বাদ দিলেন না! কেন দিদি, কেন! □

মাওবাদকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে হলে এর বৌদ্ধিক ভিতকেও ধ্বংস করতে হবে

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

নকশালবাদ, মাওবাদ বা মোটের ওপর উগ্র বামপন্থা দাঁড়িয়ে ছিল ইউরোপে উৎপন্ন এক বিজাতীয় ভাবনার নকলনবিশির ওপরে, সহজ ভাষায় টুকলি করে। বিশ্বজুড়ে অতিবামপন্থার সেই বীজ বপন করে— 'কালচারাল মার্ক্সিজম'। ড. সুকুমার সেনের ভাষায় এরা ছিল সব 'টোকা পণ্ডিত'। এই বৌদ্ধিক অনুকরণবৃত্তির মানসিকতাকে নোবেলজয়ী সাহিত্যিক ভিএস নাইপল পরিস্ফুট করেছেন এইভাবে— 'নকশালবাদ ছিল একটি বৌদ্ধিক ট্র্যাজেডি; আদর্শবাদ, অজ্ঞতা ও অনুকরণপ্রিয়তার এক করুণ বিষাদ। গান্ধীবাদী আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে মধ্যবিত্ত ভারতীয়রা নিজে থেকে কোনো নতুন আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। তাদের প্রয়োজন হয়েছিল অন্যান্য সভ্যতার থেকে কলা, বিজ্ঞান ও অন্যান্য আদর্শকে আত্মীকরণ করার। অনেক সময় তারা না বুঝেই তা করেছিল। না বোঝার কারণে বিদেশ থেকে মারাত্মক ধরনের কিছু তথাকথিত বিপ্লবী মতবাদ ধার করে তারা এইসব করেছিল। নকশাল আন্দোলন তারই ফলশ্রুতি।'

বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বামপন্থীদের মস্তিষ্কপ্রসূত সাব-অল্টার্ন তত্ত্বের বৌদ্ধিক কাঠামো অনুসারে 'সহিংস অভ্যুত্থান' ন্যায়সঙ্গত। বামপন্থী ইতিহাসবিদ রণজিৎ গুহর রচনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইউরোপে খাড়া হওয়া এই 'সাব-অল্টার্ন ইতিহাসতত্ত্ব'-কে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করার অন্যতম কারিগর হলেন তিনি। একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, 'পরবর্তী কালে আমি কিছুটা নকশালবাদী বুদ্ধিজীবী হয়ে উঠেছিলাম। আমি এখনও মনে করি যে আমি চারু মজুমদারের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। আমি মনে করি তাঁর আদর্শের যথেষ্ট বৈধতা রয়েছে।'

ভারতের ইতিহাস যেভাবে এতদিন দেখা হতো এবং ব্যাখ্যা করা হতো, তিনি তাতে এক মৌলিক পরিবর্তন আনলেন। কৃষক, শ্রমিক, জনজাতিদের মতো অবদমিত শ্রেণীর মানুষ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উপেক্ষিতই ছিলেন। তিনি তাঁদের প্রতিনিধি সেজে, তাঁদের সংগ্রামী অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে, ইউরোপীয় চিন্তাভাবনার আধারে হাজির করলেন এক নতুন ইতিহাসতত্ত্ব। উত্তর-আধুনিক যুগে ভারতের বামপন্থী ভাবনাচিন্তার জগতে এটা তার একটি নবতর অবদান। রণজিৎ গুহ দাবি করেন যে, সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীদের নিজস্ব রাজনৈতিক চেতনা প্রকাশ ও প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার রয়েছে। এই শ্রেণী সম্ভ্রান্তদের নির্দেশের পরোয়া করে না; ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী উভয় ঐতিহাসিক আখ্যানে নিহিত আভিজাত্যবাদী ধারণাগুলিকে তারা প্রতিস্পর্ধা প্রদর্শন করতে পারে বলে তিনি একটি তত্ত্ব উপস্থাপন করেন।

কিন্তু উগ্র ও অতিবাম রাজনীতির প্রতি স্পষ্ট পক্ষপাত ছিল সাব-অল্টার্ন চর্চার এবং সেটা শেষাবধি তীব্র দ্ব্যর্থবোধক ও সমস্যাসংকুল বলে প্রমাণিত হয়। সাব-অল্টার্নদের প্রতিনিধিত্ব করা এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রতিবাদ জানানোর অধিকারের ওপর এই সাব-অল্টার্ন তত্ত্বে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। এই তত্ত্ব তৎকালীন মাওবাদী আন্দোলনকে বৌদ্ধিক বৈধতা দিয়েছিল। যদি সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর মানুষদের স্বতঃপ্রণোদিত রাজনৈতিক সচেতনতা এবং প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থাকে এবং সেই সচেতনতা যদি নিজে থেকেই হিংসাত্মক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে, তবে সেই অভ্যুত্থানকে সাব-অল্টার্নদের ইচ্ছার যথার্থ বহিঃপ্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; শহুরে অতিবাম বুদ্ধিজীবীদের ব্যাখ্যানুযায়ী কোনো 'কারচুপি' হিসেবে নয়।

নকশালবাদের সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণের জন্য শুধু জঙ্গলে সশস্ত্র মাওবাদী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় লাভ করলে চলবে না; যারা এদের বৌদ্ধিক সমর্থন এবং আইনি সহায়তা দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও বিজয় প্রয়োজন।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও বিশ্ব-রাজনীতিতে অ-পাশ্চাত্য দেশগুলির আত্মোপলব্ধিতে বৃহত্তর উত্তর-ঔপনিবেশিক চর্চা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল; আবার এমন একটি বিপথগামী, বিকৃত বৌদ্ধিক কাঠামো নির্মাণ করেছিল যেখানে উগ্র ও তথাকথিত বিপ্লবাত্মক আন্দোলনকে উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিবাদের যথার্থ বহিঃপ্রকাশরূপে

'রোমান্টিসাইজ' করা যেত। উত্তর-ঔপনিবেশিক তাত্ত্বিকরা পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও সোভিয়েত কমিউনিজম উভয়কে নিন্দা করত এবং সেই পথে হেঁটে তারা এমন একটি আখ্যান বা ন্যারেটিভ তৈরি করেছিল যেখানে তারা দক্ষিণ গোলার্ধের সব দেশে সরকারি কর্তৃপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করার বিষয়টিকে সহজাতভাবে প্রগতিশীল আন্দোলন এবং মুক্তি সংগ্রাম রূপে চিত্রিত করতে পারত। এই দক্ষিণ গোলার্ধকে তারাই শখ করে নাম দিয়েছিল— 'তৃতীয় বিশ্ব'। তাদের দৃষ্টিতে এই তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম দেশ ছিল ভারত।

এই অতিবামপন্থীদের চোখে যারা অভিজাত, সেই অভিজাতশ্রেণীর দেওয়া আখ্যানকে নস্যাৎ করে প্রান্তিক গোষ্ঠীর মানুষদের নিজেদের প্রতিনিধি চয়নের ওপরে জোর দিয়েছিল এই উত্তর-ঔপনিবেশিক তত্ত্ব। বিভিন্ন দেশের সরকার কর্তৃক এই 'অভ্যুত্থান'-এর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনিক ক্ষমতা দখলের বিষয়টির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সমাজের পক্ষ থেকে এহেন অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে নিন্দা করার কারণে— এই প্রশাসনিক পদক্ষেপ ও বিপক্ষ যুক্তিকে উড়িয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন অতিবামপন্থী তত্ত্বকে একত্রিত করে কাজে লাগানো হয়। বলা হয় যে, এটা আসলে সাব-অল্টার্ন গোষ্ঠীর প্রতিবাদ- প্রতিরোধকে দমন করার জন্য অভিজাত শ্রেণীর ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের অপপ্রয়াস। যে তাত্ত্বিক কাঠামোয় ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনকে মান্যতা দেওয়া হতো, সেই সব বাম ও অতিবামপন্থী রাজনৈতিক তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে ১৯৫০-পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্বজুড়ে সমসাময়িক অভ্যুত্থানগুলিকে মান্যতা দেওয়া হয়। যে প্রক্রিয়ায় অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে শক্তিধর পাশ্চাত্য দেশগুলি অ-পাশ্চাত্য দেশগুলিকে পরাধীন করেছিল (বামপন্থীদের ব্যাখা অনুযায়ী, পাশ্চাত্য দেশগুলি সাব-অল্টার্ন, অ-পাশ্চাত্য সমাজগুলিকে বিকৃত করেছিল), সেই দেশগুলির পরাধীনতা মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে ১৯৫০-পরবর্তী অভ্যুত্থানগুলিকে একাসনে বসানোর চেষ্টা শুরু হয়। 'অভ্যুত্থান'গুলিকে এই বলে মান্যতা দেওয়া হয় যে, সেগুলি হলো ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের অব্যাহত ধারা। সমসাময়িক মাওবাদী আন্দোলনকে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী আন্দোলনের উত্তরাধিকার বলে চালানোর এই প্রচেষ্টা ছিল কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকদের সবচেয়ে বড়ো বৌদ্ধিক কারচুপি। এইভাবে অতিবাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে 'স্বাধীনতা সংগ্রাম'-এর নৈতিকতা দিয়ে মুড়ে দেওয়া হতো।

মাওবাদের রোমান্টিসাইজেশন এবং এই কাজে নিয়োজিত সর্বচেয়ে পরিচিত বৌদ্ধিক চ্যাম্পিয়ন হলেন— অরুন্ধতী রায়। নকশালবাদের সমকালীন রোমান্টিসাইজেশনের কাজে সদা সক্রিয় তিনি। ২০০০ সালে 'চিদাম্বরমের যুদ্ধ'-শিরোনামে গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে এবং ২০১১ সালে প্রকাশিত 'ওয়াকিং উইথ দ্য কমরেডস্' গ্রন্থে সশস্ত্র মাওবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, তার বই পড়লে শিক্ষিত ভারতীয় এবং অন্য দেশের নাগরিকরা এই সংঘর্ষকে নতুনভাবে বুঝবে। তিনি বলেন যে, মাওবাদীরা হলো বন্দুকধারী গান্ধী। ফলে সশস্ত্র মাওবাদী সন্ত্রাসীরা 'স্বাধীনতা যোদ্ধা'রূপে চিত্রিত হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যে গিয়ে তিনি তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। তার মধ্যে ছিল মাংটু নামের একটি শিশুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা। তিনি তাকে প্রশাসনিক নিপীড়নের শিকার-রূপে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি এ কথা বলেননি কীভাবে হিংস্র নকশালবাদীরা নিরপরাধ শিশুদের যুদ্ধের কাজে নিযুক্ত করত।

জনজাতি শিশুদের অপহরণ করে 'চাইল্ড আর্মি' তৈরির মাওবাদী অপকৌশল সযত্নে গোপন করেন অরুন্ধতী রায়। তার রচিত বইগুলির মুখ্য প্রতিপাদ্য হলো নৈরাজ্যবাদী মাওবাদী আন্দোলনকে প্রশাসনিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত লড়াই-রূপে চিহ্নিত করা। সেই সঙ্গে তিনি মানবাধিকার ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের অধিকার রক্ষার পরিভাষা কাজে লাগাতেন। তিনি বলতেন যে, মাওবাদীরা মধ্য ভারতে তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষদের একটা সম্মানের আসন দিয়েছে। ভারতীয় বনাঞ্চলকে মাওবাদীরা অর্থনৈতিকভাবে লুঠ করলেও কেন্দ্র-রাজ্যের সরকারকে এই লুঠের জন্য দায়ী করেন তিনি। নকশাল দমনে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানকে তিনি ভারতের সবচেয়ে দুর্বল নাগরিকদের জীবন-জীবিকা, বাসস্থান ধ্বংস করার বাহিনী-রূপে দাগিয়ে দিয়েছিলেন।

তার রচিত সূত্রানুসারে মাওবাদীরা হলো শোষণকারী নয়, মুক্তিদাতা। তারা নাকি দরিদ্র বনবাসী, জনজাতিদের অস্ত্রশস্ত্র ও সাংগঠনিক পরিকাঠামো দান করেছিল, তাঁদের বাঁচার পথ দেখিয়ে মুক্তি দিয়েছিল। বাস্তব পরিস্থিতির সম্পূর্ণ বিপ্রতীপ ছিল এহেন আখ্যান বা ন্যারেটিভ। ভারতীয় সংবিধানের আওতায় থেকে গণতান্ত্রিক পথে জনজাতিদের তাদের ন্যায্য অধিকার বুঝে নেওয়ার উপায় না বাৎলে তিনি তাঁদের মাওবাদীদের দেওয়া সুযোগ-সুবিধার গ্রহীতা রূপে চিহ্নিত করলেন। তিনি এই সত্যকে গুলিয়ে দিলেন যে, মাওবাদীদের থেকে পাওয়া এইসব 'সম্মান'-এর দাম জনজাতিদের দিতে হতো মাওবাদীদের সশস্ত্র বাহিনী হিসেবে লড়াই করে। মাওবাদীদের কৌশলে ভারতীয় জনজাতিরা পরিণত হলো অন্য কারুর আদর্শগত লড়াইতে শামিল হওয়া ভাড়াটে সৈন্য-রূপে।

অরুন্ধতী রায় রচিত বইয়ের সবচেয়ে মারাত্মক দিক হলো 'অভ্যুত্থান'-বিরোধী প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডকে প্রশাসন কর্তৃক অসামরিক লোকদের ওপর নিপীড়ন বলে চিত্রিত করা। তিনি তার লেখায় প্রশাসনিক সন্ত্রাসের ওপর জোর দিলেন, কিন্তু মাওবাদী হিংসার কথা পাড়লেন না। তিনি এমন একটি আখ্যান নির্মাণ করলেন যে, নিরাপত্তা বাহিনী-মাওবাদী সংঘর্ষের পূর্ণ দায় তিনি সরকারের ঘাড়ে চাপালেন, এবং এই দায় চাপানোর খেলায় তিনি অপ্রিয় সত্যিগুলিকে সযত্নে এড়িয়ে গেলেন। সত্যিগুলি হলো— এত বছর ধরে মাওবাদীরা হাজার হাজার নিরীহ, অসামরিক ব্যক্তি ও প্রশাসনিক আধিকারিককে হত্যা করেছে;তাদের হিংসাত্মক আন্দোলনে দরিদ্র জনজাতিদের যোগদানে বাধ্য করেছে; সন্ত্রাস চালিয়ে, হুমকি দিয়ে জনজাতিদের দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলন পরিচালনা করেছে; বনাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের যে জনগণকে তারা মুক্তি দেবে বলে কথা দিয়েছিল, তাঁদের থেকেই এতদিন ধরে তোলা তুলে রীতিমতো লুঠপাট চালিয়ে গিয়েছে তারা।

বুকার পুরস্কার বিজয়িনী অরুন্ধতী রায় হয়তো পুরস্কারপ্রাপ্তির পর এতটাই আত্মগর্বী হয়ে পড়েছিলেন যে, সেটাই যেন তাকে যা খুশি বলার অধিকার দিয়েছিল। বুকার জয়ী সাহিত্যিকের আন্তর্জাতিক খ্যাতি তাকে একটা সাংস্কৃতিক জোর এনে দেয়, যা তার দাবিকে যেন এক ধরনের বৈধতা দান করে। তাঁর রচিত নিবন্ধ প্রকাশিত হতো গার্ডিয়ান, আউটলুক ম্যাগাজিন, নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকায় এবং তার সাক্ষাৎকার সম্প্রচারিত হতো বিবিসি নিউজ চ্যানেলে। এইরকম একজন তথাকথিত প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব যখন বলেন যে, মাওবাদীরা জনজাতি স্বার্থে কথা বলার জন্য সঠিক গোষ্ঠী, তখন এহেন ন্যারেটিভ কোথাও যেন সরকারি নীতিনির্ধারণ সংক্রান্ত আলোচনাতেও গুরুত্ব পায়। এই সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মতামত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নতুন প্রজন্মের ছাত্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্য।

এর ফলে নিজস্ব ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা প্রচার-প্রসারের কাজে

মাওবাদীরা সেই সময় অনেকাংশে সফল হয়েছিল। তাদের উৎপাতে শুধু উগ্রপন্থায় বিশ্বাসীরা সায় দিচ্ছিল তাই নয়, সমকালীন খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী এবং বিশ্বজনীন মানবাধিকারের কথা যারা বলে— সেই সব জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনও সেগুলিই প্রতিধ্বনিত করছিল।

১৯৭০ দশকের গোড়ার দিকে পশ্চিমবঙ্গে 'শহুরে নকশাল'দের উদ্ভব ঘটে। তাদের কার্যকলাপ দমনের প্রথম পর্যায়টিকে দমন করার পরে কয়েক বছর পর এই আন্দোলন নতুন করে সংগঠিত হয়। তাদের আদর্শ ও সংগঠনে তারা অনেক রকম সংস্কার চালায় এবং ক্রমশ নতুন ধরনের কৌশলগত কাঠামো সহকারে তারা আবির্ভূত হয়। গোপন সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে তারা বিশেষ করে শহরাঞ্চল ও হোয়াইট কলার বুদ্ধিজীবীদের ওপর জোর দেয়। ২০০৪ সালে দু'টি বড়ো নকশাল গোষ্ঠী একজোট হওয়ার পরে প্রকাশ করল দলীয় নীতি সংক্রান্ত একটি সাংগঠনিক দলিল— 'ভারতীয় বিপ্লবের কৌশল ও কায়দা (স্টার) এবং শহুরে দৃষ্টিকোণ : শহরাঞ্চলে আমাদের কাজ (২০০৭)'।

এইসব সাংগঠনিক ও আদর্শগত দলিলে মাওবাদীরা যাতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যেতে পারে, তার জন্য শহুরে নকশালদের অবদান কী হবে তাই নিয়ে আলোচনা করে। তারা বুঝতে পারে যে, শহরাঞ্চলে নিরাপত্তা বাহিনী খুবই জোরালো ও সক্রিয়, তাই মুখোমুখি সংঘর্ষের পক্ষে এইসব স্থান অনুপযুক্ত। এর পরিবর্তে তারা গোপন সংগঠন ও গেরিলা বাহিনী গড়ে তোলার ওপর জোর দিল। তারা জোর দিল গ্রামীণ স্তরে অভ্যুত্থানের জন্য অর্থসংস্থানের ওপর এবং নতুন অন্তর্ভুক্ত ক্যাডারদের আদর্শগত শিক্ষাদানের ওপর। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শহরাঞ্চলে সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তারা বেছে নিল শিক্ষাজগতের মানুষ, ছাত্র, সাংবাদিক, আইনবিদ, মানবাধিকার কর্মী, সংস্কৃতি জগতের কর্মীদের।

মাওবাদীদের সাংগঠনিক দলিল শহরাঞ্চলে তাদের কার্যকারিতা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। এই দলিল অনুসারে চরমপন্থীদের আর্থিক স্বচ্ছলতা দিতে অর্থভাণ্ডার গড়ে তোলা হবে, শহরাঞ্চলে অনুদান দেওয়া হবে, ক্যাডাররা গ্রেপ্তার হলে তাদের আইনি সহায়তা দান করা হবে, পার্টির প্রচার ও ভুল খবর ছড়ানোর ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে এবং পার্টি পেশাদার বিপ্লবীদের নিযুক্ত করবে যারা শহরগুলিতে কাজ করবে। তারা জানতো যে, বৌদ্ধিক জগতের নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন ছাড়া তাদের শহরাঞ্চলের ঘাঁটিগুলি টিকবে না। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল বুদ্ধিজীবী, বিদ্বজ্জন, সাংবাদিক ও সক্রিয় কর্মীদের একটা সম্মিলিত ইকোসিস্টেম ছাড়া তাদের এই নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনটা জঙ্গল ও গ্রাম-সংবলিত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকবে।

২০১০-এর দশকে 'শহুরে নকশাল' শব্দবন্ধটির উদ্ভব ঘটে। 'আরবান নকশাল' অর্থ হলো বুদ্ধিজীবী ও পেশাদারদের একটি দল যারা জঙ্গলে অস্ত্র হাতে যাবে না বা লড়বে না, কিন্তু এই সশস্ত্র আন্দোলনকে তারা আদর্শগত, আর্থিক, আইনি ও সাংগঠনিক সমর্থন দিয়ে যাবে। এর মধ্যে থাকবে একদল বুদ্ধিজীবী যারা মাওবাদী আন্দোলনের হয়ে সহানুভূতিশীল লেখালেখি প্রকাশ করবে; সাংবাদিককুল এই অভ্যুত্থানকে সরকারি নিপীড়নের বিরুদ্ধে বৈধ প্রতিক্রিয়া রূপে বর্ণনা করবে, গ্রেপ্তার হওয়া ক্যাডারদের আইনজীবীরা আইনি সহায়তা দেবে, সাংস্কৃতিক কর্মীরা শিল্পকলা, চলচ্চিত্র ও সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে হিংসাত্মক, সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে রোমান্টিসাইজ করবে।

শহুরে নকশালবাদের বাড়াবাড়ি চূড়ান্ত পর্যায়ে যাওয়ার কারণ হলো তাদের কার্যকলাপ সবসময় বড়ো আকারে চোখে পড়ত না এবং তাদের কোনো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা ছিল না। একজন জঙ্গলে বন্দুকধারী নকশালকে সহজেই মনে করা হতো একজন সশস্ত্র যোদ্ধা-রূপে। জনজাতিদের প্রতিবাদ ইত্যাদি নিয়ে যেসব তথাকথিত বুদ্ধিজীবী সহানুভূতিশীল রচনা লিখতেন বা সরকারি উন্নয়ন প্রকল্পের বিরুদ্ধে যেসব সক্রিয় পার্টি কর্মী প্রকাশ্যে প্রতিবাদ সংগঠিত করত— তারা সেটা করতে পারত বৈধ, গণতান্ত্রিক সুবিধার সুযোগ নিয়ে। এই প্রক্রিয়ায় তারা তাদের ধ্বংসাত্মক লক্ষ্যপূরণে অনেকটা এগিয়ে যায়।

২০১৩ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক শীর্ষ আদালতে এফিডেভিট দিয়ে স্বীকার করেছে যে, এই তথাকথিত আদর্শবাদী নেতারা অর্থাৎ শহুরে নকশালরাই দেশজুড়ে মাওবাদী আন্দোলনকে জিইয়ে রেখেছে এবং এরা পিপলস্ লিবারেশন গেরিলা আর্মির চেয়েও ভয়ংকর ও বিপজ্জনক। এই চক্রের মধ্যে রয়েছে শিক্ষাজগতের লোকজন, শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, মানবাধিকার কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং মাওবাদীদের বিভিন্ন ফ্রন্টলাইন সংগঠনের হয়ে কাজ করা ছাত্র-ছাত্রীরা।

একদম বাইরের স্তরে সক্রিয় এই চক্রকে দেখে মনে হয় যে, তারা দেশের সুশীল সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন সংগঠনের লোকজন, মানবাধিকারের হয়ে সওয়াল করায় তারা ব্যাপৃত, পরিবেশ রক্ষায় উদ্যোগী পরিবেশবিদ, জাতপাত নিয়ে লড়াই করা লোকজন বা এনজিও কর্মী, সমাজসেবী। দলের ভেতরের স্তরে তারা মাওবাদী ক্যাডার নিয়োগকারী হিসেবে কাজ করে এবং জঙ্গলে মাওবাদীদের লজিস্টিক সাপোর্ট-সহ আর্থিক, আইনি ও সাংগঠনিক সহায়তা দেয়।

নকশালবাদের সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণের জন্য শুধু জঙ্গলে সশস্ত্র মাওবাদী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় লাভ করলে চলবে না; যারা এদের বৌদ্ধিক সমর্থন এবং আইনি সহায়তা দেয়, তাদের বিরুদ্ধেও বিজয় প্রয়োজন। যতক্ষণ না এই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বাধ্য করা যাচ্ছে 'বিপ্লবী' তত্ত্ব ও তার অনুশীলনের মধ্যেকার ফাঁকটা স্বীকার করাতে; যতক্ষণ না শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি মাওবাদী ক্যাডার নিয়োগ কেন্দ্র হওয়া বন্ধ করছে; যতক্ষণ না আন্তর্জাতিক বৌদ্ধিক বৃত্তের মানুষজন এদের বৈধতাদান বন্ধ করছে; এই নকশালি চক্রজালের আয়ের উৎসগুলি বন্ধ হচ্ছে; যতক্ষণ না নকশালবাদের ধ্বংসাত্মক আদর্শগত ভিত্তিকে উপড়ে ফেলা সম্ভব হচ্ছে— ততদিন এই আন্দোলনের শিকড় দেশজুড়ে অরাজকতা ও হিংসাত্মক আন্দোলনের চারাকে পুষ্ট করেই চলবে। উপরোক্ত বিষয়গুলি করা সম্ভবপর হলে তবেই কেবল ভিএস নাইপল যে অসুখটিকে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে শনাক্ত করেছিলেন এবং যে অসুখটা আজও ভারতকে নানাভাবে ক্ষতবিক্ষত করে চলেছে— তার সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণও সম্ভব হবে। □

স্বস্তিকার বিজ্ঞাপনের দরপত্র (এক সপ্তাহের জন্য)

Back Cover	(Multi Colour)	Rs. 32,000.00
Front Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Back Inside	(Multi Colour)	Rs. 25,000.00
Full Page	(Multi Colour)	Rs. 20,000.00
Full Page	(Black & White)	Rs. 15,000.00
Half Page	(Black & White)	Rs. 8,000.00
Qtr. Page	(Black & White)	Rs. 4,000.00

** *বিজ্ঞাপনের টাকা জমা পড়লে বিজ্ঞাপন ছাপানো হবে।*

যোগাযোগ — মো : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

পশ্চিমবঙ্গে ‘বাবরি মসজিদ’ ভবিষ্যতের অশনি সংকেত বহন করছে

মণীন্দ্রনাথ সাহা

নিজের ঘোষণা মতো গত ৬ ডিসেম্বর হুমায়ুন কবির মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করলেন। তাঁর আহ্বানে শতশত মুসলমান শিলান্যাসস্থলে উপস্থিত হয়ে সাহস জোগালো হুমায়ুনকে। রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায় খুশিতে ডগমগ। সন্দেহ জাগে হঠাৎ হুমায়ুনের বাবরি মসজিদ নির্মাণের সাহস জোগালো কে বা কারা?

অনেকের অভিমত--- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপরিকল্পিতভাবে হুমায়ুন কবিরকে দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার পরিকল্পনা করেছেন। তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেত্রী তাই একাধিকবার হুমায়ুনকে যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন, তেমনি অন্যদিকে তাকে লোকদেখানো সাসপেন্ড করেছেন দল থেকে। আগামী ’২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগেই যে হুমায়ুনকে পুনরায় দলে ফিরিয়ে নেবেন তা হলফ করে বলা যায়। আবার হুমায়ুনও বলেছেন, তিনি দু’টি সিটে ভোট জিতে জামাই আদরে তৃণমূলে ফিরবেন।

মহম্মদ আলি জিন্না, সুরাবর্দিরা ১৯৪৬ সালে কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার করে পাকিস্তান আদায় করেছিল। মুর্শিদাবাদেও এই বাবরি মসজিদ একদিন সারা ভারতের মাথাব্যথার কারণ হতে চলেছে। একদিন সারা ভারত থেকে কোটি কোটি লোক এখানে এসে জমায়েত করবে। একদিন এই বাবরি মসজিদ পশ্চিমবঙ্গের জেহাদিদের শুধু নয়, সারা ভারতের জেহাদিদের নেতৃত্ব দেবে। এছাড়া হয়তো দেখা যাবে, আজ থেকে ৩০-৩৫ বছর পরে এই বাবরিকে কেন্দ্র করে দুই বঙ্গ এক হয়ে যাবে, সেটা ঠেকানোর ক্ষমতা হয়তো কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের থাকবে না। অথচ দুই সরকার শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, মসজিদের শিলান্যাস বন্ধ করতে কিন্তু কোনো ব্যবস্থা নিল না। এমনকী শিলান্যাস অনুষ্ঠানে স্থগিতাদেশ দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের ৭ কোটি হিন্দুদের জন্য কবর খোঁড়া হলো আর পুনরায় ভারত বিভাজনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হলো।

এই মুর্শিদাবাদেই বামফ্রন্ট আমলে ১৯৮৮ সালে কাটরা মসজিদে নমাজের ডাক দিয়েছিলেন মুসলিম লিগের নেতা হাসানুজ্জামান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে তাঁরা এই আহ্বান থেকে পিছিয়ে যান। সেসময় ইন্টারনেট, মোবাইল ছিল না। ফলে মানুষকে জানানো সম্ভব হয়নি যে নমাজ পড়ার ডাক স্থগিত করা হয়েছে। আর মুসলিম লিগ নেতারাও ওইদিন ওইস্থানে হাজির ছিলেন না। কিন্তু হাজার হাজার বহিরাগত মুসলমান তাদের বাচ্চাদের নিয়ে নমাজ পড়ার জন্য অজানা, অচেনা পথে কাটরা মসজিদের দিকে রওনা হয়। তাদের মধ্যে বহু অতি উৎসাহী মুসলমানের নানা কর্মকাণ্ডের ফলে বহু মানুষ প্রাণ হারায়।

হুমায়ুন কবিরের মনে রাখা উচিত অযথা যে কোনো একটা ইস্যু খাড়া করে সাধারণ মানুষকে বিপদের মধ্যে ফেলে কোনো লাভ হয় না। কাটরা কাণ্ডের ‘দেব কমিশন’-এর রিপোর্ট আজও ঠান্ডা ঘরে। মুসলমানদের মসিহা হয়ে ওঠা হুমায়ুন এ বিষয়ে কখনো বিধানসভা বা জনসমক্ষে কোনো আওয়াজ তোলেননি কেন? বিধানসভার আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে কি আওয়াজ তুলবেন? আদৌ কি কাটরা মসজিদের জন্য তার ভাবনা আছে, নাকি বাবরি নির্মাণের পিছনে তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ আছে তাই কাটরা মসজিদের কথা বেমালুম চেপে গেছেন?

অনেকেই আলোচনা করছেন এই বলে যে— সম্প্রতি বিহারের সীমাঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনে কিছু আসনে আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মিম পার্টির জয়ের পর হুমায়ুন কবিরও ওয়েইসির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তিনি মজহবি বিষয়গুলি উত্থাপন করে সমস্ত মুসলমান ভোট নিজের পক্ষে আনতে চান। তাই তিনি একটি সাম্প্রদায়িক কার্ড খেললেন এবং বাবরির শিলান্যাস করলেন। তিনি হয়তো ভালো করেই জানতেন যে এই কাজের জন্য তাকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হবে। তিনি সেই অপেক্ষাতেই ছিলেন। এরপর তিনি একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করবেন। শিলান্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি মুর্শিদাবাদের মুসলমানদের একত্রিত করার চেষ্টা করলেন এবং আগামী দিনে মজহবি সমাবেশে তাকে ভোট দেওয়ার জন্য বোঝাবেন যেন ওয়েইসির মতো তিনিও মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা হতে পারেন এবং কয়েকটি বিধানসভা আসন জিততে পারেন।

সম্প্রতি সংসদে পাশ হয়েছে ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন। প্রথমে তৃণমূলনেত্রীর নেতৃত্বাধীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই কেন্দ্রীয় আইনটি না মানার ঘোষণা করলেও সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ যে, আইনটি মেনে নিয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে রাজ্যের দ্বিতীয় সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠীর ভোটব্যাংক ধরে রাখতে অন্য কৌশল গ্রহণ করেছেন তৃণমূলনেত্রী। হুমায়ুনের দলত্যাগের কুনাট্য তারই একটি অংশ হতে পারে। একের পর এক জগন্নাথ, মহাকাল, দুর্গামন্দির করতে গিয়ে সরকারি অর্থের অপচয় করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকারি অর্থে নির্মিত এগুলির একটিও আদৌ কোনো ‘মন্দির’ নয়। ভোটের

ফঃ ২

আগে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করতে এই ধরনের কিছু 'কমপ্লেক্স' উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী, যা ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের গন্তব্যস্থল নয়, ট্যুরিস্ট স্পট মাত্র। এ রাজ্যে সরকারি অর্থে এখনও মসজিদ তৈরি হয়নি যদিও। নানা কারণে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা ভিড় করতে শুরু করেছে--- সিপিএম, কংগ্রেস, আইএসএফ দলের সঙ্গে। আর এতেই বিপদে পড়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাহলে উপায় কী? উপায় হুমায়ুন। তাই তাকে দিয়ে বাবরি শিলান্যাস। মুসলমান সম্প্রদায় আনন্দিত। হুমায়ুন দু'টো আসনে লড়ে তৃণমূলের বকলমে ভোটটা নেবে। তারপর দিদির চরণে নিজেকে অর্পণ করবে। হুমায়ুন নিজেও সেকথা বলেছেন যে— 'দু'টি আসন থেকে লড়ে জিতব, তারপর জামাই আদরে তৃণমূলে ঢুকবো।' আশ্চর্যের বিষয় হলো, মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের পর এই মসজিদ নির্মাণে হুমায়ুনের ফান্ডে একদিনে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ হয়েছে। হুমায়ুনের পিছনে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি শক্তির মদত ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মুসলমানরা বাবরি মসজিদ তৈরির জন্য ইতিমধ্যেই কোটি কোটি টাকা দান করেছে। স্বাধীনতা লাভের ৭৮ বছর পরেও ভারতের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারেনি মুসলমান সম্প্রদায়ের বড়ো অংশ। কংগ্রেসি, কমিউনিস্টদের সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ এবং নির্লজ্জ তোষণ রাজনীতির কারণে এদেশে জন্মে, বড়ো হয়ে উঠলেও বহিরাগত, আক্রমণকারী 'বাবর'কেই এখনও তাদের 'পূর্বপুরুষ' ভাবছে ভারতীয় মুসলমানরা। কোনো স্থানে মুসলমানদের জমিতে কোনো মসজিদ গড়ে উঠলে তাতে কারুর কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংসকারী 'বাবর'-এর মতো চরিত্রের নামানুসারে মসজিদের নামকরণের বিষয়টি রীতিমতো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হুমায়ুনকে সামনে রেখে রাজ্যে মুসলমান ভোট মেরুকরণের রাজনীতি করছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী। উসকানিমূলক, বিষাক্ত কথাবার্তা এবং বেআইনি কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও হুমায়ুনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বিকার মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসন। হুমায়ুনের পিছনে মুখ্যমন্ত্রীর পরোক্ষ মদতের বিষয়টি এতে স্পষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাবাবেগে সর্বদা তীব্র আঘাত হানে এই 'বাবরি মসজিদ'। উজবেকিস্তানের ফারগানা থেকে এসে ভারত আক্রমণ করে জেহাদি জাহিরুদ্দিন বাবর। তার নামাঙ্কিত মসজিদ ফারগানাতে তৈরি হওয়া উচিত। অযোধ্যা বা মুর্শিদাবাদে নয়।

বাবরি মসজিদ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে যে একতা ও উৎসাহ দেখা গিয়েছে, ওইরকম একতা হিন্দুদের মধ্যে কখনোই দেখা যায় না। এখানেই পার্থক্য যে, এই রাজ্যে মুসলমানেরা ৩৫ শতাংশ হয়েও সরকারের নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরায় অথচ হিন্দুরা ৬৫ শতাংশ হয়েও তা পারে না। ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা যদি ভোটদান ও রাজ্য সরকার নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমত হতে না পারে তাহলে ২০২১-এর ভোটের ফল প্রকাশের পর যা ঘটেছিল তার চেয়ে বহুগুণ বেশি ভয়ংকর পরিস্থিতির জন্য তারা যেন তৈরি থাকে।

ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুধেল গাইয়েরা হুমকি দিতে শুরু করেছে এই বলে যে— 'কেউ বাবরি মসজিদ গড়তে বাধা দিলে গর্দান কেটে ফুটবল খেলবো।' মমতা ব্যানার্জির সাহস আছে পুলিশ দিয়ে এদের গ্রেপ্তার করানোর?

হিন্দুদের ভুললে চলবে না যে, গর্দান কেটে ফুটবল খেলার কথা যে বা যারা বলছে, তাদের নতুন মসিহা হুমায়ুন কিছুদিন আগেই বলেছেন, 'আমরা ইচ্ছা করলে দুই ঘণ্টার মধ্যে মুর্শিদাবাদের ৩০ শতাংশকে কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারি।' তাছাড়া তৃণমূলের মুসলমান নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমও বলেছেন, 'ইসলামে যারা জন্মগ্রহণ করেননি— তারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন, তাদেরকে ইসলামে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে আসতে হবে।' ঠিক যেন ১৯৪৬ সালে মহম্মদ আলি জিন্না আর খাজা নাজিমুদ্দিনের কথার প্রতিধ্বনি। জিন্না বলেছিলেন— 'আমাদের হাতে পিস্তল আছে এবং সে পিস্তল আমরা ব্যবহার করার ক্ষমতাও রাখি।' আর নাজিমুদ্দিন বলেছিলেন— 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মানে কী মুসলমানরা তা ভালোভাবেই জানে।'

২২ ডিসেম্বর বহরমপুর টেক্সটাইল মোড়ে একটি জনসভা করার ডাক দিয়েছেন হুমায়ুন কবির। সেই সভায় একটি নতুন রাজনৈতিক দল আত্মপ্রকাশ করবে বলে সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন তিনি। এক লক্ষ লোক সেই সভায় উপস্থিত হবে বলে তার দাবি। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের আগামীদিনে একটি বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে যে, তাঁদের বাঁচাতে না আসবে তৃণমূল, না আসবে কংগ্রেস, সিপিএম বা অন্য কেউ। বাঁচতে হলে তাঁদের নিজেদেরই একজোট হয়ে বাঁচতে হবে। আরও মনে রাখতে হবে, ১৯৪৬ সালে কলকাতা হিন্দু হত্যায় হিন্দুদের বাঁচাতে আসেনি তৎকালীন কোনো রাজনৈতিক শক্তি। হিন্দুদের বাঁচিয়েছিলেন বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় -সহ হিন্দু-বৌদ্ধ-শিখ-আর্য সমাজী তরুণরা একজোট হয়ে। ১৯৮৯ সালে ফারুক আবদুল্লার হাত থেকে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের কেউ বাঁচাতে আসেনি, তাই জেহাদিদের হাতে লক্ষ লক্ষ কাশ্মীরি পণ্ডিত মরেছে আর বাকিরা কাশ্মীর থেকে পালিয়ে নিজ দেশে শরণার্থী হয়েছে। ২০০২ সালে গুজরাটের গোধরায় হাজি বিলাল হোসেন সেভাবে ট্রেন পুড়িয়ে হিন্দু হত্যা শুরু করেছিল তাতে হিন্দুরা যদি একজোট না হতো তাহলে কত হাজার হিন্দু যে প্রাণ-হারাত তা বলা মুশকিল। সেখানে হিন্দুরা একজোট হয়েছিল বলে বেঁচে গিয়েছিল। আর ১৯৭৭ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের অবস্থা তো সবাই দেখতে পাচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর 'মন্দির' উদ্বোধনের কুনাট্যে হিন্দুরা ভুলে যাবেন না। তথাকথিত প্রগতিশীল, বামপন্থী হতে গিয়ে ঊর্ধ্বমুখে পথ চলবেন না। সামনে খানাখন্দে উলটে গিয়ে হাড়গোড় ভেঙে পড়ে থাকলে কেউ দেখতে আসবে না। □

ভারতে জেহাদের বীজ নির্মূল করতে কঠোর পদক্ষেপ প্রয়োজন

ভারতের মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা-সহ সব ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতে হবে। বিচারবিভাগীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে কড়া আইন প্রণয়ন অত্যন্ত জরুরি।

অর্ণব কুমার দে

যখন যেমন প্রয়োজন হয়েছে বিভিন্ন জিনিস আবিষ্কার করেছে মানুষ। এই আবিষ্কার করতে গিয়ে নতুন বিষয় জানতে পেরেছে। সেই জ্ঞান যাতে নষ্ট বা বিলুপ্ত না হয় তাই অন্যকে সমর্পণ করেছে। সেই জ্ঞান দান বা সমর্পণকে 'শিক্ষা' বলে গণ্য করা হয়েছে। জ্ঞানের আলোয় শিক্ষিত হয়ে পৃথিবীর সীমা ছাড়িয়ে দূরে আরও দূরে মহাকাশের জ্ঞানকেও করায়ত্ত করেছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের ভিতরে সৃষ্টি হওয়া রিপুগুলিও প্রবৃদ্ধি লাভ করেছে। সেই কামনায় বশীভূত হয়ে, তাদের লব্ধ শিক্ষাকে ব্যবহার করে কামনা চরিতার্থ করার প্রয়াস করেছে। যেমন কোনো বস্তুকে মসৃণ ভাবে কাটতে ছুরি আবিষ্কৃত হয়েছে, আবার সেই ছুরির দ্বারা হত্যাও করা হয়েছে। বহু যুগ আগে হিন্দু গণিতশাস্ত্রে অণু ও পরমাণুর কথা সময় দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছিল। বর্ষপ্রতিপদের বিষয় চর্চা করলে দেখা যায় ভারতের প্রাচীন ঋষিরা মুহূর্ত, পল, নিমেষ করতে করতে ক্ষুদ্র অণু পরমাণুর সময়ের মাপে গিয়ে পৌঁছেছিলেন। বর্তমান বিশ্ব সেই পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করছে। আবার সেই একই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করে মানুষের প্রাণ নাশের লক্ষ্যেও কাজ করছে।

প্রায় হাজার বছর আগে 'ইসলাম'-নামক একটি ব্যবস্থা আরবের মরুপ্রান্তর থেকে প্রকাশ পায়। তার আগে পর্যন্ত আরব দুনিয়াতে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল। আরবে কিছু বেদুইন বা যাযাবর শ্রেণীর লোকের বসবাস ছিল। কাবার মন্দিরে অনেক দেবদেবীর মূর্তি ছিল বলে নানা ঐতিহাসিক বিবরণ অনুযায়ী জানা যায়। আরব দেশের উত্তর ভাগে ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নামের দুটি নদীর কূলবর্তী অঞ্চলে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে একটি কৃষি সভ্যতা বিকশিত হয় যা কিনা 'মেসোপটেমিয়া' নামে প্রসিদ্ধ হয়। আরও পশ্চিমে যে সকল জনজাতির বসবাস ছিল তারা প্রায় ৩৫০টি দেবদেবীর মূর্তি পূজা করতো এবং সেগুলো মক্কা শহরের কাবা পাথরকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত ছিল। হজরত মহম্মদ নামে কোরায়েশ গোষ্ঠীর এক ব্যক্তি সেগুলোকে ধ্বংস করে এবং বিভিন্ন আরবীয় জনগোষ্ঠীর ওপর তার সেনাবল দিয়ে প্রভুত্ব স্থাপন করে। তার কিছুকাল পরে এদের গোষ্ঠী একটি গ্রন্থ রচনা করে যার নাম আল-কুরান বা আল-কোরান।

সেখানে তারা একটি বিষয়ে নিয়ে আসে তাহলো কাফির বা কাফের নামক একটি শব্দ, যার সরল অর্থ বিধর্মী। এই বিধর্মী শব্দটিও সঠিক তর্জমা নয়, কারণ বহু সমাজ-ধর্ম বিজ্ঞানীরা 'ইসলাম' কোনো ধর্ম নয় বলেই মনে করেন। এটি একটি মজহব, সেই মজহবের বিরোধিতা যারা করে তারাই 'কাফির'। তার বিরোধিতা করলে তার জন্য শাস্তিবিধান করা হয়েছে। তাদের নিদান অনুযায়ী বিরোধিতার সাজা হলো মৃত্যু। এদিকে পৃথিবীতে বহু মজহব বা রিলিজিয়ন প্রচলিত আছে, তাহলে উপায়? সবাইকে তো হত্যা করা যাবে না। তখন তারা বলল, পৃথিবী দার-উল-হার্ব (অর্থাৎ কাফেরদের পৃথিবী), তাকে দার-উল-ইসলাম (ইসলামের পৃথিবী) বানাতে হবে। যারা তাদের এই প্রথাকে মেনে নেবে তাদের মাফ, আর যারা অর্থের বিনিময় বদান্যতা স্বীকার করবে তাদেরকেও মাফ করা যাবে। এছাড়া বাদবাকি সবাইকে হত্যা করবার নিদান দেওয়া হয়েছে।

বিগত এক হাজার বছরের কিছুকাল আগে থেকে যারা এই আরব সাম্রাজ্যবাদের প্রথাকে গ্রহণ করেছে, তারা পৃথিবীকে এই দার-উল-ইসলামে পরিণত করার নির্দেশিকাকে গ্রহণ করে আসছে। সেই কারণবশত এই মজহব ভারতে তাদের সঙ্গে প্রবেশ করেছে। বিশেষ কিছু অঞ্চলে এই দস্যুদল যখন শাসনক্ষমতা কায়েম করেছে তখন তারা বলপূর্বক ধর্মান্তরণ করেছে এবং জিজিয়া কর বসিয়েছে। এভাবে চলতে চলতে ব্রিটিশের হাত থেকে ভারত যখন স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, তখন ভারতের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সঙ্গে থাকতে পারবে না বলে এই মুসলমানরা তাদের জন্য আলাদা ভূখণ্ডের দাবি করেছে। তদানীন্তন কংগ্রেস নেতা গান্ধী-নেহরুর বদান্যতায় তারা তা পেয়েও গেছে। ভারত ভেঙে সৃষ্টি হয়েছে 'পাকিস্তান'। কিন্তু দার-উল-ইসলামের স্বপ্নটি তাদের অন্তরে থেকেই গিয়েছে। তার ফলে ভারতে তারা

ক্রমাগত জেহাদ চালিয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি দিল্লি বিস্ফোরণ তারই প্রতিচ্ছবি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

১৯৪৭-পরবর্তী পর্যায়ে পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতে একটা বড়ো অংশের মুসলমান থেকে যায়। কিন্তু তারা এই দার-উল-ইসলাম প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন তাদের মনে-প্রাণে বপন করেই চলেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পরে তিনি মনে করেন মুসলমানদের শিক্ষার অভাবে এরা হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটিয়ে থাকে, তাই তিনি বলেন এই যুগে দাঁড়িয়ে মুসলমানদের এক হাতে কম্পিউটার আর অন্য হতে কোরান থাকা উচিত। এই ভাবনাটি আপাতদৃষ্টিতে ভালো মনে হলেও দেখতে হবে আসলে এর সত্যতা ও প্রাসঙ্গিকতা কতটা। গত অর্ধ শতাব্দী ধরে মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছে তাদের ভিতর মাসুদ আজাহার, ওসামা-বিন-লাদেন, আয়মান আল জাওয়াহিরি, মহম্মদ আটা— এরা যথাক্রমে বি.কম., সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার ও অ্যারোনটিক্স ইঞ্জিনিয়ার। আবু-বাকার-আল-বাগদাদি (ইসলামিক স্টেট) ডক্টরেট, হাফিজ-সাইদ (লস্কর-ই-তৈবা) মাস্টার ডিগ্রি প্রাপ্ত ব্যক্তি। এছাড়া বুরহান ওয়ানি, জাকির নায়েকের মতো অনেকেই প্রচলিত যোগ্যতা অর্জন করেছে।

সম্প্রতি দিল্লির বুকে গাড়ি বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত ডাক্তার, সফট্‌ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার বা কেমিস্ট্রির জ্ঞানলব্ধ সন্ত্রাসবাদীরা ধরা পড়েছে। তারা সাধারণ ক্যাস্টর অয়েলের বীজ থেকে বিষ আবিষ্কার করেছে। তাদের শিক্ষার কোনো ঘাটতি নেই বলেই ধরে নিতে হবে। তাই শিক্ষার অভাবে মুসলমানরা সন্ত্রাসবাদী হচ্ছে, একথা মেনে নেওয়া যায় না। সরকারি বঞ্চনার জন্য তারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে, তা যদি ধরা হয়, তাহলে স্বাধীনতার পর থেকে মাইনরিটি রাইটস্ (সংখ্যালঘু অধিকার), হজ সাবসিডি, ওয়াকফ বোর্ড, পার্সোনাল ল'-বোর্ড, জম্মু-কাশ্মীরে 'রোশনি অ্যাক্ট' পাশ করিয়ে জমি পাইয়ে দেওয়ার মতো অনেক সুবিধা ভারতীয় মুসলমানদের দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় অনেক মুসলমানকে বাড়ি দেওয়া হয়েছে, অথচ তারা কেউ ২০২৪ সালের জাতীয় নির্বাচনে সেই প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করেনি।

তাহলে কেন এই 'হোয়াইট কলার টেররিজম'? তার উত্তর একমাত্র নিহিত আছে তাদের আল-কোরানের ২ : ১-৫, ৯ : ৫ ইত্যাদি আয়াতে। জেহাদিদের বিশ্বাস আসমানি কিতাব বা সেই মজহবে লিপ্ত থাকে। যারা বিশ্বাস করে সেখান থেকে যাবতীয় 'শিক্ষা' নেওয়া উচিত, তারা দেশে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথাগত শিক্ষা নিলেও 'দীক্ষা' তাদের হয়নি। তারা বিশিষ্ট জ্ঞানের যে আঙ্গিকে শিক্ষা নিয়ে থাকুক না কেন তাদের অজ্ঞান নিহিত আছে তাদের মজহবে।

এবার বুঝে নিতে হবে কোন কোন ধরনের সন্ত্রাসবাদী আমাদের চারিদিকে কাজ করছে। অশিক্ষিত পাথর ছোড়ার দল, অন্যদেশে থেকে আগত জেহাদি সৈনিক, রাজনৈতিক মদতপ্রাপ্ত সন্ত্রাসবাদী (Politically indulged terrorism), দেশের অভ্যন্তরে উম্মার (অর্থাৎ ইসলামিক ব্রাদারহুডের) পৃষ্ঠপোষক জেহাদি দল, হোয়াইট কলার সন্ত্রাসবাদী, সাইবার সন্ত্রাসবাদী, এছাড়া আর্থিক সন্ত্রাসবাদীরা নানাভাবে এদেশের সাধারণ মানুষকে ঘিরে রয়েছে। দিকে দিকে এই আততায়ীদের সংখ্যা বাড়ছে। জেহাদের ক্ষেত্রে এরা আবার বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে যেমন ড্রাগ স্মাগলিং (মাদক পাচার), ফ্লেশ ট্রেড (মানব পাচার), অস্ত্র পাচার, চোরাচালান ইত্যাদি। ভারতের অভ্যন্তরে IISC, IIT, AIIMS, Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), Management College, Engineering College, Law College এবং সমাজ বিজ্ঞান ও ইসলামিক ইতিহাস চর্চাকেন্দ্রগুলিতে যেসব ইসলামি ছাত্র-ছাত্রী আছে তাদের উপর নজরদারি করার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে। একদল রাজনীতির লোক তাদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে এদের সমর্থন করার কারণে সেই রাজনৈতিক ব্যক্তিদেরও আইনের আওতায় আনা প্রয়োজন। এদের যে C টিম আছে যারা মানবাধিকারের দোহাই দিয়ে, APDR বা অন্য কোনো NGO খুলে, যে প্রত্যক্ষ সমর্থন করে তাদের উদ্দেশ্য নিয়েও ওঠে নানা প্রশ্ন। দেশজুড়ে তাদের বিভিন্ন ঠিকানায় খানাতল্লাশিও জরুরি। আইনজীবীদের একটি অংশ যারা এদের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে, এদের বাঁচাতে আদালতে মামলা লড়ে— তাদেরও আতশকাচের নীচে আনা প্রয়োজন।

এছাড়া এই সন্ত্রাসবাদীদের পাড়া-প্রতিবেশী যারা এদের ঘটানো ধ্বংসাত্মক ঘটনার পরে এই জেহাদিদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদীদের পরিবারের সঙ্গে তাদের যোগাযোগের খোঁজখবর রাখা প্রয়োজন। সন্ত্রাসবাদী হামলা ঘটানো জেহাদির ফাঁসি হলে বা নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে কোনো জেহাদির মৃত্যু হলে তাদের মরদেহ নিয়ে এই প্রতিবেশীদের রীতিমতো জানাজা সংগঠিত করতে দেখা যায়। সমাজ সচেতনতার ভান করে যারা হালাল মুরগি চায় বা ওয়াকফ আইন, তিন তালাক ইত্যাদির বিরুদ্ধে চুপ থাকে, তাদেরকেও সন্দেহের বাইরে রাখলে মানুষ বিপদে পড়বে। তাই তাদের সম্পর্কেও সঠিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন রয়েছে। এদের ফান্ডিঙের সূত্রগুলির দিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে। জাকাত, বিদেশি অর্থ, ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে আয়ের উৎস ও ব্যয়খাতগুলির ওপর নজরদারি এবং আইনের বাঁধন তীব্র হলেই সাপ নির্বিষ হতে থাকবে। এই আল-কোরানের বিষাক্ত আয়াতগুলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট-সহ সব রাজ্যের হাইকোর্টে কয়েক হাজার পাবলিক ইন্টারেস্ট লিটিগেশন দায়ের করার প্রয়োজন রয়েছে। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সাম্প্রতিককালে তাঁর দেশের মসজিদে বিদেশি অর্থ সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা জারি করেছেন। ভারতের মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা-সহ সব ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব খতিয়ে দেখতে হবে। বিচারবিভাগীয় প্রতিবন্ধকতা দূর করে কড়া আইন প্রণয়ন না করলে ভারতীয় নাগরিকদের জন্য আগামীদিনে যে নির্মম পরিণতি অপেক্ষা করছে তা বলাই বাহুল্য।

বাবরির শিলান্যাস-‘পুতনার’ ছলনায় বাঙ্গালি আর ভুলবে না

শিবেন্দ্র ত্রিপাঠী

গত ৬ ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বিধায়ক হুমায়ুন কবির বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করেছেন। এ কোনো সাধারণ মসজিদের শিলান্যাস নয়। বিদেশী আক্রমণকারী বাবর ৫০০ বছর আগে অযোধ্যায় শ্রীরামের জন্মস্থানে প্রাচীন রামমন্দির ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বাবরি মসজিদ নামে একটি মসজিদ তৈরি করেছিল। এ দেশের হিন্দুদের ৫০০ বছরের অবিরাম সংঘর্ষ ও ১০০ বছরের আইনি লড়াইয়ের পর সুপ্রিম কোর্টের আদেশে তার স্থানে এক ভব্য শ্রীরামলালার মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাবর-পুত্রদের তা একেবারেই পছন্দ নয়। তাদের এদেশে অত্যাচারী দস্যু বাবরের নামেই মসজিদ চাই। তাই বেলডাঙ্গায় এই বাবর নামাঙ্কিত মসজিদের শিলান্যাস।

মসজিদ নির্মাণ একটি সাধারণ ঘটনা। এই রাজ্যে প্রতিনিয়ত কত মসজিদই গড়ে উঠছে কেউ তার হিসাব রাখে না। কিন্তু এই মসজিদের শিলান্যাস এরাজ্যের রাজনৈতিক মহলে কয়েকটি প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। এক, এই বুদ্ধি কি হুমায়ুন কবিরের নিজের নাকি অন্য কারো মস্তিস্ক প্রসূত? দুই, ২০২৬-এর নির্বাচনের মাত্র ৪ মাস আগে হঠাৎ করে বাবরের নামে মসজিদ গড়া হচ্ছে কেন? তিন, এই রাজ্যে বাবরের নামে মসজিদ কেন?

অনেকেই বলছে এই কুনাট্যের রচয়িতা আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। এ তার রাজনৈতিক চাল। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর চলছে। এসআইআর-এ লক্ষ লক্ষ অনুপ্রবেশকারী মুসলমান ও রোহিঙ্গা ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাচ্ছে। তাই তিনি চোখে সর্ষেফুল দেখছেন। সোজা পথে শাসন ক্ষমতা ফিরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব বুঝে তিনি চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক তাস খেলে দিয়েছেন। হুমায়ুনকে দিয়ে বাবরির শিলান্যাস করিয়ে একদিকে তিনি রাজ্যের ৩৫ শতাংশ মুসলমানের ভোট এককাট্টা করলেন। তার সঙ্গে সত্তর শতাংশ মুসলমান অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলায় নওশাদ বা ওয়েসিরা যাতে কোনোভাবেই ভাগ বসাতে না পারে, সবগুলি আসনেই যাতে হুমায়ুন জয়ী হয় তার বন্দোবস্ত করে দিলেন। এখন লোক দেখানো বহিষ্কার। নির্বাচনের পর দশটা-বিশটা আসন জেতা হুমায়ুনই হবে ‘দিদির’ তুরুপের তাস। হুমায়ুন তখন পালটি খেয়ে বলবেন ‘উনি’ না থাকলে আমার বাবরি নির্মাণ সম্ভবই হতো না। তাই আমি দিদির সঙ্গে। তিনি আবার একথা মুখ ফসকে বলেও ফেলেছেন— ‘রেজিনগর ও বেলডাঙ্গা দু’জায়গা থেকেই ভোটে দাঁড়াব, জিতব, তারপর মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গিয়ে জামাই আদরে দলে ঢুকব’। তাই বাবরি-ঘোমটার আড়ালে অনেকে খ্যামটা নাচ দেখতে পাচ্ছেন।

সন্দেহ জাগার কারণ, এই কাণ্ডে মুখ্যমন্ত্রী এখনও মৌন। তিনি নিজে একটি বাক্যও উচ্চারণ করেননি। তার এক্স হ্যান্ডেল, টুইটার, ফেসবুক কোথাও এর বিরুদ্ধে একটি কথাও বলা নেই। বরং শিলান্যাস যাতে নির্বিঘ্নে হয় তার জন্য বাঘা বাঘা পুলিশ অফিসার, কয়েকশো কমব্যাট ফোর্স, র‍্যাফ সকলে পাহারায় ছিল। তিনি যদি আদৌ বাবরির বিরোধী হতেন তবে কি তার প্রশাসন এই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিত? আসলে বিভিন্ন কারণে মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারছিলেন মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। মুসলমান ভোট বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তিনি মুসলমান ভোটকে একত্রিত করতে হুমায়ুনকে মাঠে নামিয়ে দিলেন।

এ তো গেল মুসলমান ভোটের কিস্সা। তবে হিন্দু ভোটের কী হবে। তার নাটকও ফেঁদে রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বোকা হিন্দুর মন ভোলাতে আর নিজেকে হিন্দুহিতৈষী প্রমাণ করতে তাঁর একান্ত অনুগত ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে হুমায়ুনকে লোক দেখানো বহিষ্কার করলেন। কে এই ফিরহাদ? যে ফিরহাদ একদা কলকাতার একটি এলাকাকে ‘মিনি পাকিস্তান’ বলেছিলেন। যিনি কিছুদিন আগে বলেছিলেন ‘পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চাশ শতাংশ মানুষকে তিনি উর্দু ভাষায় কথা বলতে দেখতে চান’। যিনি প্রকাশ্য সভায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ‘যারা ইসলাম নিয়ে জন্মায়নি (অর্থাৎ হিন্দুরা) তারা দুর্ভাগা, তাদের ইসলামে ধর্মান্তরিত করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যদি এতই হিন্দুপ্রেমী হন তবে তার জন্য ফিরহাদকে কেন ওই সময় দল থেকে বহিষ্কার করেননি? বরং আদর করে তাকে মন্ত্রীসভায় সাজিয়ে রেখেছেন। এই তার হিন্দু-প্রীতির নমুনা? আর এখন সেই ফিরহাদকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুমায়ুন বহিষ্কারের নাটক করলেন। আসলে বকলমে মুখ্যমন্ত্রী বাবরি গড়তে চাইছেন। নাহলে তার শাসনে কারও সাধ্য আছে তা গড়ার? আর যদি ধরেই নিই বাবরির শিলান্যাস করে হুমায়ুন সম্প্রীতি নষ্ট করছেন, তবে তার জন্য তাকে অ্যারেস্ট না করে শুধু দল থেকে বহিষ্কার করা হলো কেন? ২০২৩ সালে সিএএ বিরোধিতার নামে এই হুমায়ুনের দলবল যখন সারা মুর্শিদাবাদে আগুন জ্বালিয়েছিল তখন মুখ্যমন্ত্রী কোথায় ছিলেন? এই হুমায়ুনই যখন ২০২৪ সালে বলেছিলেন, ‘মুর্শিদাবাদে আমরা সত্তর, তোমরা তিরিশ, চাইলে হিন্দুদের কেটে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দিতে পারি’ তখন কেন তাকে বহিষ্কার করা হয়নি? এই সেদিন যখন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী প্রকাশ্য সভায় ‘গ্রামকে টাইট দেওয়া’র হুমকি দিলেন, আর তারপর মুর্শিদাবাদ জুড়ে হিন্দু আক্রান্ত হলো, মানুষ মরল, মোথাবাড়ি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জের মা-বোনেরা ঘর ছেড়ে পালালো, তখন তিনি কোথায় ছিলেন? তাকে কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করতে দেখেছেন? সিদ্দিকুল্লাকে তার জন্য বহিস্কার করতে দেখেছেন? দেখেনি। আসলে ‘মৌনং সম্মতি লক্ষণম্’।

চ্যালাচামুণ্ডাদের কথা ছাড়ুন, এই মুখ্যমন্ত্রী তো এবছর ইদের নামাজে গিয়ে হিন্দু ধর্মকে ‘গন্দা ধর্ম’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। আসলে তিনি একদিকে হিন্দু বিরোধিতা করে ৩৫ শতাংশ মুসলমান ভোট পকেটে পুরতে চান, অন্যদিকে সব হিন্দু ভোট যাতে বিজেপির দিকে না চলে যায়, কিছু নিজের দিকে আসে তার জন্য মাঝে মাঝে একটু হিন্দু প্রীতির ভাব দেখান। নাহলে হুমায়ুনকে তাড়াতে তাকে ৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো কেন? তিনি যেদিন হিন্দুকে কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন, বাবরি তৈরির হুমকি দিয়েছিলেন, সেদিন তাড়ালেন না কেন? ‘ইঙ্গিতে পণ্ডিত বোঝে, মূর্খ বোঝে কিলে’। আমরা যদি অবুঝ হই, মুখ্যমন্ত্রীর ইঙ্গিত না বুঝতে পারি, তবে তার দায় তো তার নয়? বাবরি শিলান্যাসের পরদিন এক সাংবাদিক বন্ধু হুমায়ুনকে প্রশ্ন করেছিলেন ‘আপনি যেদিন ৩০ শতাংশকে কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার কথা বললেন আপনাকে কেউ বারণ করেনি? তিরস্কার করেনি? উত্তরে হুমায়ুন বলেছিলেন ‘অভিষেক আমায় জিজ্ঞাসা করেছিল। আমি তার উত্তরে বলেছি—এই কথা আমাকে না, দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন’। যদি হুমায়ুনের কথা সত্যি হয় তবে বলতে হবে সেদিন হুমায়ুন যে হুমকি দিয়েছিলেন তা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর শেখানো বুলি।

২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে মুসলমান ভোট এককাট্টা করার এক পন্থা ছিল মাত্র।

আজ বাঙ্গালির মনে প্রশ্ন জাগতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গে বাবরের নামে মসজিদ কেন? মহাপুরুষের কি অভাব পড়েছে? মসজিদ যদি গড়তেই হয় তবে তা গড়া উচিত সন্ত কবিরের নামে, হাজি মহম্মদ মহসিনের নামে, আব্দুল হামিদের নামে, এপিজে আবদুল কালামের নামে। কিন্তু তা না করে দস্যু বাবরের নামে কেন? আসলে এ সেই জেহাদি মানসিকতা। বাবরের নাম শুনলেই এদেশে হিন্দুর মনে তার ধর্ম-অবমাননার ছবি ভেসে ওঠে, মা-বোনের উপর অত্যাচারের, বেদনার কথা মনে পড়ে, চোখে ভেসে ওঠে তার আরাধ্য দেবতার শত শত মন্দির অপবিত্র হওয়ার স্মৃতি, মনে আসে মধ্যযুগের বর্বরতার কাহিনি। নাহলে যে বাবরের বাবা ছিলেন উজবেকিস্তানের আর মা ছিলেন মঙ্গোলিয়ান, সেই বাবরের সঙ্গে এই মুসলমানদের সম্পর্ক কী? না রক্তের, না DNA-এর। বরং খুঁজলে দেখা যাবে পাঁচ-সাত পুরুষ আগে এদেশের মুসলমানদের পূর্বপুরুষ সকলেই হিন্দু ছিলেন। তবে বিদেশি বাবরের নামে মসজিদ কেন? আসলে বাবরি মসজিদ গড়ে এরা হিন্দুর মনে অতীতের দুঃখের ইতিহাস স্মরণ করাতে চায়। আর বলিহারি আমাদের বিচারব্যবস্থাকে। বিচারকরা কি ছোটবেলায় ইতিহাস বই পড়েননি? পড়েননি বিদেশি আক্রমণকারী বাবরের ক্রূরতার কাহিনি? মরুদস্যু বাবর আমাদের পূর্বপুরুষ মা-বোনের উপর যে অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল তা কি তাদের অজানা? বিচারের সময় এগুলি কি তাদের মনে একবারও আসেনি? এই রাজ্যে শত শত মসজিদ তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে তো কারোর মনে সংশয় জাগেনি? কিন্তু আজ বাবরের নামে মসজিদ তৈরির অনুমতি দিয়ে আপনারা যে বিতর্কের অবতারণা করলেন তাতে কি আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে ধর্মীয় হানাহানির দিকে ঠেলে দিলেন না? এদেশে কি কেউ যে কোন নামে মসজিদ তৈরির অনুমতি পেতে পারে? কাল যদি কেউ সোমনাথ ধ্বংসী গজনির নামে, চেঙ্গিজ খানের নামে, তৈমুরলঙের নামে, নালন্দা ধ্বংসকারী বখতিয়ার খিলজির নামে, আফজল গুরু, আজমল কাসাব, হাফিজ সইদের নামে মসজিদ গড়তে চায় তবে কি আপনারা তার অনুমতি দেবেন? বাবর কোনো মহাপুরুষের নাম নয়, বাবর হলো এদেশে ক্রূরতা, হিংস্রতা, নরহত্যা, মন্দির ধ্বংস, মা-বোনের সতীত্ব লুণ্ঠনকারীর এক নরপশুর নাম। সেখানে মুর্শিদাবাদের মতো অতি সেনসিটিভ জেলায় এমন বিতর্কিত নামে মসজিদ নির্মাণের পারমিশন দিয়ে আপনারা কি এরাজ্যের শান্তিশৃঙ্খলার প্রতি ন্যায় বিচার করলেন?

বাবরির শিলান্যাস বাঙ্গালি হিন্দুকে আজ আয়নার সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তার শত্রু-মিত্র চেনার সুযোগ করে দিয়েছে। বামপন্থী মুখোশের আড়ালে যে লিবারাল মাওবাদী যাদবপুরিয়া দুর্বুদ্ধি ভাতাজীবীরা দু'বছর আগে অযোধ্যার শ্রীরামমন্দির নির্মাণের সময় ওখানে মন্দির না গড়ে সেখানে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল গড়ার পরামর্শ দিয়েছিল, তারা এখন বাবরির শিলান্যাসের পর আর স্কুল-কলেজ, হাসপাতালের নাম মুখে আনছে না। যে সিপিএম 'ধর্ম কি ভাত দেবে?', 'মন্দির কি কাজ দেবে?' বলে বেড়াত, তারা বাবরি শিলান্যাসের পরে সবাই মুখে কুলুপ এঁটেছে। তারা একবারও বলছে না যে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে বাবরি মসজিদ চাই না, তার জায়গায় হাসপাতাল চাই, স্কুল চাই, ভাত চাই। আর মুখ্যমন্ত্রীর 'দম দেওয়া কলের-পুতুল' বাংলাপক্ষের গর্গ চ্যাটার্জি, যে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বহিরাগত বলেছিল, সে ৬ ডিসেম্বরের পর থেকে নিখোঁজ। গর্ত থেকে বেরোলে তার কাছে জানতে চাইব বাবর বাঙ্গালি না অবাঙ্গালি? বাঙ্গালি অস্মিতার আবেগ তুলে বাবরির বিরুদ্ধে হবে নাকি একটা প্রতিবাদ কর্মসূচি? ইতিহাস সাক্ষী, হাজার বছর ধরে মুসলমান আক্রমণকারীরা এদেশে হিন্দু-হিন্দুধর্ম-হিন্দুত্বকে সমূলে নাশ করার সব রকমের প্রয়াস করছে, তবু তাকে নিঃশেষ করতে পারেনি। আজকের দিনের বাবরপুত্ররাও সেই চেষ্টায় লেগে রয়েছে। তাই হিন্দুর বিপদ আজ বাইরে নয়, ঘরের ভেতরে। রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে এরাজ্যের কোনায় কোনায় জেগে উঠেছে পাঠান মোগলের বংশধরেরা। তারাই বাবরি গড়তে হাজার হাজার ইট বয়ে আনছে, বস্তা-বস্তা টাকা দিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইসলামিক ফাউন্ডেশন'-এর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট। এসব দেখেও যদি আমরা সচেতন না হই, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেনা ঘাড়ে বয়ে বেড়াই, ধর্মনিরপেক্ষতার নেশায় বুঁদ হয়ে থাকি, দুই কুসুমের গপ্পে বিভোর হই তবে অদূর ভবিষ্যতে আমাদেরই পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠবে মোহাম্মদ ঘোরি, চেঙ্গিস, গজনির নামে শত শত সৌধ। আর আমাদের সেই পাঠান মোগল দস্যুদের অসমাপ্ত স্বপ্ন সফল হতে দেখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার কালান্তর প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'কত বিপদ গিয়েছে, কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এলো মোহাম্মদ ঘোরি, তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগলো, মূর্তি চূর্ণ হতে লাগলো, তখন তারা লড়েছে মরেছে। খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলাম বলেই মেরেছে। (স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রবন্ধ, মাঘ ১৩৩৩)। হিন্দুকে আজ সজাগ হতে হবে। 'হিন্দু যদি সজাগ না হয় তাহলে গর্ভের সন্তানও নিরাপদ নয়'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই সাবধান বাণী স্মরণে রাখতে হবে।

তবে আজকের ভারতও সেই আগের ভারত নেই। হিন্দুরাও নেই সেই আগের হিন্দু। আজকের যুগের বাবর-পুত্ররা যদি মনে করে এই রাজ্যের চার বিঘা জমিতে সৌধ গড়ে অত্যাচারী বাবরের স্মৃতি ফিরিয়ে আনবেন, তবে আজ তাদের আর বিঘা নয়, হাজার হাজার একর জমি জোগাড় করতে হবে। আর শুধু বাবরি গড়লেই হবে না। আপনাদের শীঘ্রই ঠিক করতে হবে আগামীতে কাশীর জ্ঞানব্যাপী মসজিদ কোথায় নির্মাণ করবেন, মথুরার শাহী ইদগাহ কোথায় স্থাপন করবেন, মালদহের আদিনা-সহ কয়েক হাজার গম্ভুজ মিনার কোথায় গড়ে তুলবেন। কারণ যে লড়াইটা আজ আপনারা শুরু করলেন বা আপনাকে দিয়ে শুরু করানো হলো, তার বিপরীত লড়াইটাও কিন্তু আপনাদের লড়তে হবে। তার জন্য ভারতের আশি শতাংশ মানুষও তৈরি। সেদিন আপনারা সে লড়াই লড়তে পারবেন তো? আপনি যেমন বলছেন বাবরি নিয়ে মানুষের আবেগ আছে, ঠিক তেমনি এদেশের ১২৫ কোটি হিন্দুর মথুরার শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমি নিয়ে আবেগ আছে, কাশীর শিবমন্দির নিয়ে আবেগ আছে, মধ্যপ্রদেশের ভোজশালা নিয়ে আবেগ আছে, মালদার আদিনাথ শিবালয় নিয়ে আবেগ আছে। আগামীদিনে সেই আবেগ ফুটে বেরোলে আপনাদের আবেগ প্রতিষ্ঠা করার জন্য হাজার হাজার একর জমি দরকার, তাও এখন থেকে খুঁজে রাখুন।

পরিশেষে বলি, আমাদের দুই মহাকাব্যে দুই রাক্ষসীর চরিত্র আছে। একটি তাড়কা, অন্যটি পুতনা। তাড়কার রূপ-বেশ-আচরণ সবই রাক্ষসীর মতো তাই তাকে সহজে চেনা যেত। সে ছিল প্রকাশ্য শত্রু। শ্রীরামচন্দ্র তাকে সহজে বধ করেছিলেন। আর মহাভারতের পুতনা, সেও রাক্ষসী। কিন্তু সে এসেছিল মায়ের রূপ ধরে, বিষ মাখানো স্তন্যপান করিয়ে শিশু কৃষ্ণকে হত্যা করতে। সে ছিল ছদ্মবেশী, ছলনাময়ী। তাই সকলে তাকে চিনতে পারেনি। একমাত্র শিশুকৃষ্ণ তাকে চিনেছিলেন, বধ করেছিলেন। হুমায়ুনরা তো প্রকাশ্য শত্রু, কিন্তু পর্দার আড়ালে যে পুতনারা লুকিয়ে আছে বাঙ্গালিকে সবার আগে তাকে চিনতে হবে। □

স্বস্তিকা পত্রিকার গোড়ার কথা

ডঃ পঙ্কজ কুমার রায়

অখণ্ড ভারতের পরিবর্তে দেশভাগের যন্ত্রণা থেকে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর জন্মাষ্টমী তিথিতে 'স্বস্তিকা'-র আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথম সম্পাদক ছিলেন হেমেন্দ্র পণ্ডিত। যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া সেদিন স্বস্তিকার প্রকাশ অসম্ভব ছিল তাঁরা হলেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য, ভৈরব ভট্টাচার্য, অনিল ভট্টাচার্য ও সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৫১ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তৎকালীন ক্ষেত্র প্রচারক একনাথজী রাণাডের তত্ত্বাবধানে স্বস্তিকা 'ট্রাস্ট' হিসেবে নথিভুক্ত হয়। ট্রাস্টিরা ছিলেন অমল কুমার বসু, অধ্যক্ষ কেশব চন্দ্র চক্রবর্তী, ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী। পরবর্তীকালে একনাথজী রাণাডের নির্দেশে নিরলসভাবে স্বস্তিকার দায়িত্বভার তুলে নিলেন ভবেন্দু ভট্টাচার্য। পরে অল্প সময়ের জন্য অসীম মিত্র। ১৯৮৫ সাল থেকে দীর্ঘদিন নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন ড.বিজয় আঢ্য। সেই ধারা বহন করে বর্তমানে ড. তিলকরঞ্জন বেরা সম্পাদকের এবং সুকেশচন্দ্র মণ্ডল সহসম্পাদকের দায়িত্ব বহন করে চলেছেন।

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী (১৮৬২-১৯৫১) রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) বাল্যবন্ধু ও ওরিয়েন্টাল সেমিনারিতে একই ক্লাসে পড়তেন। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে এসে স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সচিবের দায়িত্ব পালন করেন এবং পরবর্তী জীবনে স্যার সুরেন্দ্রনাথের জামাতা হন। স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, "এ দেশের মানুষ স্বল্পায়ু ও ক্ষীণজীবী, শ্রমবিমুখ ও আরামলোলুপ, সামান্য সফলতা লাভেই তৃপ্ত, গর্ব্বিত ও স্ফীত, পল্লবগ্রাহী; ঈর্ষাপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর— এদেশে এও দ্রুম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই দেশে সুরেন্দ্রনাথের ন্যায়, বিদ্যাসাগরের ন্যায় কিংবা আশুতোষের ন্যায় নির্ভীক, তেজস্বী, বলদৃপ্ত পুরুষ-সিংহের জন্ম কি কেবল প্রকৃতির লীলাসঞ্জাত? তাহা মনে হয় না। বাঙালী জাতির অন্তরে এমন প্রাণশক্তি এখনও প্রচ্ছন্ন আছে যাহাতে এই সকল বিরাট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব সম্ভবপর হইয়াছে।"

১৯৩৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী (মাধব

রণদেব চৌধুরী

যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী

সদাশিবরাও গোলওয়ালকর) কলকাতায় কয়েকমাস ছিলেন। ১৯৪০ সালে ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের প্রয়াণের পর তিনি নাগপুরে ফিরে আসেন এবং সরসঙ্ঘচালকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৯ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ নিষিদ্ধ থাকে। শ্রীগুরুজী সহস্রাধিক স্বয়ংসেবক-সহ কারান্তরালে থাকেন। পরবর্তী বছরগুলিতে তিনি প্রায় প্রতিবছর কলকাতায় আসতেন।

১৯৪৯—১৯৫০ সালের অন্তবর্তী সময়ে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর ৩৪ নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে শ্রীগুরুজীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যার ফলশ্রুতিতে যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর পুত্র ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী স্বস্তিকার 'ট্রাস্টি বডি'র সদস্য হন। শুধু শ্রীগুরুজীর পদধূলিতে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ি ধন্য হয়নি, একসময় হিন্দু মহাসভার প্রতিষ্ঠাতা বীর সাভারকরের আগমন ঘটেছিল এই বাড়িতে। রণদেব চৌধুরীর পুত্র যশোদেব চৌধুরী (১৯৪০) স্মৃতি থেকে বলেন, আমার বাল্যাবস্থায় একাধিকবার শ্রীগুরুজীকে আমাদের বাড়িতে দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। দাদুর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় বাবা উপস্থিত থাকতেন।

সঙ্ঘের প্রচারক একনাথ রাণাডের প্রেরণায় জাতীয়তাবাদী বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশনা ঘটে ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর, যখন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ গান্ধীহত্যার মিথ্যা ষড়যন্ত্রে নিষিদ্ধ। একনাথজীর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৯৬৩ সালে বিবেকানন্দ রক মেমোরিয়াল কমিটি গঠিত হয় এবং কন্যাকুমারীতে সমুদ্রস্থিত শিলাখণ্ডে বিবেকানন্দ স্মারক তৈরি হয়। গৌতম বুদ্ধ যেমন সারনাথ বোধিবৃক্ষের নীচে বোধিলাভ করেছিলেন তেমনি বিবেকানন্দের বোধিলাভ ঘটে যে পবিত্রস্থানে তা বিবেকানন্দ রক নামে সমাদৃত। বলা হয়, "Swami Vivekananda, who is said to have attained enlightenment on the rock." বিবেকানন্দ রকের উদ্বাটন ঘটেছিল ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭০ তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরির হাতে। সেই অনুষ্ঠানে ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী মীরা চৌধুরী ও পুত্র যশোদেব চৌধুরীকে নিয়ে একনাথ রাণাডের আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ রকে যান। মীরা চৌধুরী ছিলেন এলাহাবাদের ব্যারিস্টার দুর্গাচরণ ব্যানার্জির কন্যা এবং ইন্দিরা নেহরুর সহপাঠিনী। একনাথ রাণাডে রণদেব চৌধুরীকে আমন্ত্রণ করতে এসেছিলেন ১৯৭০ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে। ১৯৬৭ সালে অতিবাম আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ যখন উত্তাল। সেই অগ্নিঝরা দিনে বিখ্যাত ব্যারিস্টার রণদেব চৌধুরী সনাতন আদর্শে অবিচল থেকে 'স্বস্তিকা' সাপ্তাহিককে কেবল সমৃদ্ধ করেননি, সনাতন কর্মযজ্ঞ কন্যাকুমারী পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। ইতিহাসের অনেক অজানা রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি। ২০১৬ সালে এই প্রতিবেদক ব্যক্তিগতভাবে অধ্যক্ষ হিসেবে যশোদেব চৌধুরীকে 'রণদেব চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা' দেবার জন্য কলেজে আমন্ত্রণ জানায়। সেই সময় ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় তিনি কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বসে সাক্ষাতের সময় তিনি ডাইনিং স্পেসের সংলগ্ন ঘর দেখিয়ে শ্রীগুরুজীর সঙ্গে রণদেব চৌধুরীর সাক্ষাতের কথা স্মরণ করেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—
শ্রী যশোদেব চৌধুরী এবং ড. বিজয় আঢ্য

(লেখক যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ)

ভারতীয় মেয়েরা আজ হয়ে উঠেছে 'অপরাজিতা'

অজয় ভট্টাচার্য

ওয়ার্ল্ড ইকনমিক ফোরামের গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০২৫ অনুযায়ী, ভারত শিক্ষা অর্জন বিভাগে লিঙ্গ বৈষম্যে ৯৭.১ শতাংশ স্কোর করেছে। অর্থাৎ শিক্ষায় সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তিতে ভারতে নারী-পুরুষ সমতা অর্জন করেছে। মেয়েরা এখন ছেলেদের মতোই স্কুল-কলেজে ভর্তি হচ্ছে, পড়াশোনা করছে এবং উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, যদি ১০০ জন ছেলে স্কুলে যায়, তাহলে এখন প্রায় ৯৭ জন মেয়েও স্কুলে যাচ্ছে— আগে এই সংখ্যা ছিল ৭০-৮০ জনে সীমাবদ্ধ। শিক্ষাক্ষেত্রে মেয়েরা এখন ছেলেদের সমান সুযোগ পাচ্ছে— যা দেশের জন্য একটি ইতিবাচক দিক। প্রসঙ্গত সমাজের প্রকৃত অগ্রগতি তখনই সম্ভব, যখন নারী ও পুরুষ উভয়েরই সমানভাবে শিক্ষার আলো পায়। কারণ শিক্ষা কেবল জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষা আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মান ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেয়। তাই নারীর শিক্ষা আসলে ক্ষমতায়নের প্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী ধাপ। শিক্ষিত নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে এবং পরিবার ও সমাজে সমতার দাবিদার হয়। একজন শিক্ষিত মা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও শিক্ষার মূল্য শেখায়। ফলে একটি শিক্ষিত নারী গোটা সমাজকে আলোকিত করতে পারে। তবে গ্রামীণ অঞ্চল ও দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এখনো কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়ে গেছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দরিদ্রতা, কুসংস্কার ও অল্পবয়সে বিয়ে— যা নারীর শিক্ষার পথে বড়ো অন্তরায়। তাই সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা ও মানসিক পরিবর্তনও অত্যন্ত জরুরি।

একদিকে ভারত নারী ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধায় প্রায় সম্পূর্ণ সমতা অর্জন করেছে, আর অন্যদিকে মুম্বইয়ে প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ জিতে নিল ভারতের মেয়েরা। ভারতের মেয়েরা দেখিয়ে দিল, তাঁরাও খেলাধুলায় কোনো অংশে পিছিয়ে নেই। কঠোর পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ও দলগত চেষ্টায় তারা প্রমাণ করেছে ছেলেদের মতো তারাও বিশ্বকাপ জিতে নিতে পারে। একসময় যেখানে ক্রিকেটকে শুধুমাত্র পুরুষদের খেলা বলে মনে করা হতো, আজ সেখানে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটাররা দেশের গর্ব হয়ে উঠেছে। তাদের এই সাফল্য কেবল খেলাধুলায় নয়, নারীর ক্ষমতায়নেরও এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আর সেই ক্ষমতায়নের আইকন হতে চলেছেন হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মা ও রিচা ঘোষের মতো বীরাঙ্গনারা। ভারতের মেয়েরা দেখিয়ে দিয়েছে— সুযোগ পেলে তাঁরাও দেশের জন্য গৌরব ছিনিয়ে আনতে পারেন। তাঁদের এই কৃতিত্ব যে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মেয়েদের খেলাধুলায় অংশ নিতে আরও উৎসাহিত করবে, তা বালাই বাহুল্য।

অন্যদিকে ২৯ অক্টোবর ২০২৫, আম্বালা এয়ারবেস থেকে ভারতীয় বায়ুসেনার সবচেয়ে উন্নত মাল্টিরোল কমব্যাট এয়ারক্রাফট্ রাফালে সওয়ার হলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাফাল যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়ে তিনি এক ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবন সূত্রে খবর, দ্রৌপদীই প্রথম রাষ্ট্রপতি, যিনি বায়ুসেনার দু'দুটি আলাদা রকম যুদ্ধবিমানে উড়েছেন। ২০২৩ সালে অসমের তেজপুর সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন তিনি। তাঁর আধ ঘণ্টার রাফাল উড়ানটি মাটি থেকে প্রায় ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় উড়েছিল এবং উড়ানটির গতিবেগ ছিল প্রতি ঘণ্টায় ৭০০ কিলোমিটার। এই সাহসী পদক্ষেপের মাধ্যমে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন যে ভারতের মেয়েরা আজ কোনো ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। ঘটনাটি ভারতের নারী শক্তির আত্মবিশ্বাস ও অগ্রগতির প্রতীক হয়ে রইল। রাষ্ট্রপতির এই উদ্যোগ যে দেশের তরুণ প্রজন্ম, বিশেষ করে হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মা ও রিচা ঘোষদের অনুপ্রাণিত করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরে ভিজিটর বুকে রাষ্ট্রপতি লেখেন, 'রাফালে সওয়ার হয়ে আমি আপ্লুত। এই উড়ান আমার কাছে না ভোলার মতো একটি অভিজ্ঞতা'। বিমান সফরের একাধিক ছবি সমাজমাধ্যমে প্রকাশ করেছিল বায়ুসেনা। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে যার একটিতে রাষ্ট্রপতির পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন দেশের একমাত্র মহিলা রাফাল পাইলট শিবাঙ্গী সিংহ। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীর বাসিন্তা শিবাঙ্গী অপারেশন সিঁদুরে অংশ নিয়েছিলেন। সেই সময়ে পাকিস্তান-সহ বিদেশি সংবাদমাধ্যমের একাংশ দাবি করেছিল, শিবাঙ্গীর রাফাল বিমান গুলি করে নামিয়েছে পাকিস্তান এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সেই শিবাঙ্গীকেই রাষ্ট্রপতির পাশে দাঁড় করিয়ে, ছবি প্রকাশ করে বায়ুসেনা বুঝিয়ে দিল যে পাক সরকার ও সে দেশের সংবাদমাধ্যমের সেই দাবি ছিল ভুয়ো। যে দেশে নারী শক্তিকে দেবী রূপে পূজা করা হয়, সেই দেশের শিবাঙ্গী, হরমনপ্রীত কৌর, দীপ্তি শর্মা, শেফালি বর্মা ও রিচা ঘোষরা যে অপরাজিতা, তাও প্রমাণিত হয় ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে। □

ভারতীয় মুসলমানদের আদর্শ বাবর বা জিন্না নয়

আমরা অনেকেই জানি, পদ্মশ্রী কে কে মহম্মদকে। তিনি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের অন্যতম সেরা পুরাতত্ত্ববিদ। তিনি সেই পুরাতত্ত্ববিদ, যাঁর নেতৃত্বে রামমন্দির জন্মভূমিতে খননকার্য হয়েছিল বাবরি মসজিদ কোনো মন্দির ধ্বংস করে নির্মাণ হয়েছিল কিনা তার প্রমাণের জন্য। তিনি কোর্টে রিপোর্ট পেশ করেন, এটি একটি মন্দির ছিল, সেই মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ হয়। তিনি প্রকাশ্যে স্বীকার করেছেন আমি উপাসনা পদ্ধতিতে মুসলমান হলেও ভারতভূমির আদি সংস্কৃতি ও ইতিহাস কি করে অস্বীকার করবো? কী করে অস্বীকার করবো যে, মুসলমান আক্রমণকারীরা শ্রীরামজন্মভূমি, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির এবং মথুরা শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমিকে ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছে অস্ত্রের জোরে। ভারতীয় মুসলমানরা যদি হিন্দুদের সঙ্গে সুন্দর সম্পর্ক চায় তাহলে তাদের প্রায়শ্চিত্ত করে পূর্বপুরুষের ভুল শুধরে কাশী ও মথুরা হিন্দুদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এই একই কথা তিনি কয়েকদিন আগেও বলেছেন। তাঁর মতের সঙ্গে যদিও অধিকাংশ মুসলমান একমত নয়। তাদের মত— বেশ করেছে মোগল শাসকরা হিন্দু মন্দির ভেঙে মসজিদ করেছে, যতই প্রমাণ থাকুক, আমরা ফেরত দেব না। কিন্তু তারপরেও এই সমাজ থেকেই বেরিয়ে এসেছেন এপিজে আব্দুল কালাম, কে কে মহম্মদ, যাদের কাছে দেশ ও দেশের পরম্পরা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রকার মুসলমানরাই হোক বাকি মুসলমান সমাজের আদর্শ। বাবর নয়, জিন্না নয়।

—**দেবজ্যোতি পণ্ডিত,** কাঞ্চনতার, মালদা।

এসআইআর-এ কোনো ভারতীয় বাদ পড়বে না

নির্বচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টে জানিয়েছেন কোনো ভারতীয় (বৈধ) ভোটার SIR-এ বাদ যাবে না। তৃণমূল নেতৃত্ব কি এটা জানে না? যদি জেনে থাকে তাহলে বিশ্বাস নেই কেন? কেন বিভ্রান্তি ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে? বৈধ ভারতীয় তো হিন্দু, মুসলমান সবাই আছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মুখে দেশের সংবিধানের কথা বলে। সংবিধানের পাতা উলটে দেখেছে কিনা আজ সেটাই প্রশ্ন। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। ভারতীয় সংবিধান Parliamentary Democracy-কে স্বীকার করেছে। যেখানে কোনো আইন পাশ করতে member present and voting-এর উপর নির্ভর করে। কেন বিল উভয় সভায় পাশ হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি স্বাক্ষরের পর তা আইনে পরিণত হয়। ঠিক সেই ভাবেই বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও আফগানিস্তান থেকে সে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দু, খ্রিস্টান ও শিখ ধর্মীয় কারণে নিপীড়িত হয়ে যারা শরণার্থী হয়ে এদেশে আশ্রয় নিয়েছেন তারাও আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিক হবেন। তারাও এদেশের বৈধ ভোটার।

তাহলে SIR-এ বাদ পড়লো কারা? কোনোভাবে ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান নয়। বাদ পড়বে অবৈধ ভাবে সীমান্ত পেরিয়ে এদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশি ও পাকিস্তানি ও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশকারী মুসলমানরাই। সেই জন্যই কি তৃণমূলের এতো মড়াকান্না? এতো দিন সিপিআইএম ও তৃণমূলের লালন পালনে এরা পুষ্ট হয়েছে। এরা ভারতীয় মুসলমান ও হিন্দু উভয়ের ভাত মেরেছে এবং কর্ম সংস্থানেও ভাগ বসিয়েছে। দেশ এইসব অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বিদেশি মুসলমানদের ভার কেন বহন করবে? ১৯৪৭ সালে তো 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' স্লোগান দিয়ে ভারত ভেঙে পাকিস্তান নিয়েছো! এরপর আর কেন? তৃণমূল ও তাদের ইন্ডি জোট কি শুধু এদের জন্য এতো আস্ফালন করছে?

—**শ্যামল কুমার হাতি,**
চাঁদমারি রোড, হাওড়া-৯।

কলকাতা হাইকোর্ট কি সেকুলার!

হাইকোর্টে এখন কর্মসংস্কৃতির পাট উঠে যাচ্ছে। ইসলাম চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। হাইকোর্টকে কেন্দ্র করে রয়েছে বিরাট মসজিদ। ওই মসজিদের সংস্কার, নতুন করে নির্মাণ, বৃদ্ধির কোনো অনুমতি হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে নেই বলে আমার জানা। হাইকোর্ট এ ব্যাপারে উদাসীন। প্রতি শুক্রবার হাইকোর্টের মুসলমান স্টাফরা অফিসের কাজকর্ম শিকেয় তুলে নামাজ পড়তে চলে যায়। ওই সময় ওখানের যাতায়াতের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ওখানে নিউ রেকর্ড ডিপার্টমেন্টের দুটো স্টোররুম আছে যেখানে বিভিন্ন কোর্ট এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের ফাইল সাপ্লাই করতে হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবে এই সময় ওই স্টোররুমে ঢোকা যায় না, ফাইল সাপ্লাইও করা যায় না। তাই ওইদুটো রুম বন্ধ রাখতে হয়। হাইকোর্টের মেন বিল্ডিঙের মাথায় একটা মসজিদ আছে, অনেকের হয়তো জানা নেই। পুরো হাইকোর্ট তাড়াতাড়ি মসজিদে পরিণত হবে, তখন করার কিছু থাকবে না। হাইকোর্টের স্টাফদের কখনো কখনো খাওয়ার ব্যবস্থা হলে হালাল মাংস না থাকলে মুসলমান স্টাফরা ওই খাওয়াদাওয়া বয়কট করে। হিন্দু স্টাফরা নতি স্বীকার করে হালাল মাংস খেয়ে তৃপ্ত সহকারে ঢেকুর তুলি ভালো হয়েছে বলে।

প্রশ্ন হলো, অফিস আওয়ারে কাজ না করে মসজিদে নামাজ পড়া যায়? হাইকোর্ট কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া নামাজ পড়া অপরাধ নয় কি? হিন্দু স্টাফরাও বৃহস্পতিবার মন্দিরে প্রার্থনা করার প্রয়োজন অনুভব করে। তখন হিন্দুরা শুরু করলে হাইকোর্ট চলবে তো? অফিসের কাজের সমতা আনতে এরকম বন্ধ করা দরকার। হাইকোর্টের কর্তৃপক্ষের নজরে আনার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। হাইকোর্টের অ্যাডভোকেটদের অবগতির জন্যে একথা লিখতে বাধ্য হচ্ছি। সবাই দেখেও দেখছে না। গেটে গেটে পুলিশের তৎপরতা চোখে পড়ে কিন্তু মসজিদের ভিড়ে শুক্রবার ছাড়া অন্য দিনেও ওদিকে পা রাখা যায় না। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বকর্মা ঘোষণা করেছেন মুসলমান বিধায়কদের অ্যাসেম্বলির সেশন চলাকালীন নামাজে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ। তাকে হয় নামাজ পড়তে হবে, নয় তাকে বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এক্ষেত্রেও তাই দরকার। মুসলমান স্টাফদের হয় নামাজ পড়তে হবে, নয় তাকে চাকরি ছাড়তে হবে।

—**সুবল সরদার,**
মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

ফঃ ৩

পশ্চিমবঙ্গে আজ ভাতা, বিজ্ঞাপন আর ভাঙ্গাচোরা অর্থনীতি

সোমনাথ গোস্বামী

এক সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল ভারতের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড। যাটের দশকে দেশের মোট জাতীয় আয়ের প্রায় ১০.৫ শতাংশ এই রাজ্য একাই বহন করত। শিল্প উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল দেশের মোট উৎপাদনের ২০ শতাংশেরও বেশি। কলকাতা ছিল ব্যাংক, বিমা, বন্দর-বাণিজ্য ও ভারী শিল্পের কেন্দ্র। আজ সেই চিত্র সম্পূর্ণ উলটো। ২০২৩-২৪ সালে রাজ্যের জাতীয় আয়ে অংশীদারিত্ব নেমে এসেছে মাত্র ৫.৬ শতাংশে। মাথাপিছু আয় যা এক সময় জাতীয় গড়ের চেয়ে ২৭ শতাংশ বেশি ছিল, আজ তা জাতীয় গড়ের ১৭ শতাংশেরও নীচে। এই পতন কোনো আকস্মিক ধাক্কা নয়, গত পনেরো বছরে তৃণমূল শাসনামলে এই অবনমন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি আরও দ্রুত বেড়েছে, ফলে পশ্চিমবঙ্গ আজ দেশের মূল স্রোতের বাইরে দাঁড়িয়ে।

রাজ্য সরকার নিয়মিত দাবি করে যে মুখ্যমন্ত্রীর বিদেশ সফর এবং বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট এই রাজ্যে বিনিয়োগের সুনামি এনেছে। বাস্তব হলো এই দাবি সম্পূর্ণ উলটো। ২০১০-১১ সালে যেখানে ভারতের মোট বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগে পশ্চিমবঙ্গের অংশ ছিল প্রায় ২-৩ শতাংশ, তা ২০১৫-১৬ নাগাদ নেমে আসে ১ শতাংশের নীচে। ২০১৯ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে এই হার কার্যত ০.৫-০.৭ শতাংশ ঘোরাফেরা করেছে। একই সময়ে মহারাষ্ট্র একাই মোট এফডিআই-এর ৩০-৩১ শতাংশ, কর্ণাটক ২০-২২ শতাংশ, গুজরাত ১৫-১৭ শতাংশ টেনেছে। বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর মঞ্চে ঘোষণা হয়েছে কখনো ২ লক্ষ কোটি, কখনো ৫ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ প্রতিশ্রুতির কথা, কিন্তু বাস্তবে নতুন বড়ো শিল্পাঞ্চল, উৎপাদন কেন্দ্র বা বহুজাতিক কোম্পানির কারখানা দেখা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রীর জার্মানি, ইংল্যান্ড, স্পেন, সিঙ্গাপুর সফরের পরও বাস্তব বিনিয়োগ প্রবাহে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসেনি। সম্মেলন হয়েছে, ছবি উঠেছে, হাত মেলানো হয়েছে— কিন্তু মাটিতে কারখানা দাঁড়ায়নি।

ব্যাংক ঋণের পরিসংখ্যান এই ভঙ্গুর বাস্তবতাকে আরও নগ্ন করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের বহু জেলায় আজও ঋণ-আমানত অনুপাত ৪০-৫০ শতাংশে আটকে। রাজ্যের গড় প্রায় ৫২ শতাংশ, যেখানে জাতীয় গড় প্রায় ৭০ শতাংশ। এই তারতম্য কোনো ষড়যন্ত্র নয়, এটি ঝুঁকির অঙ্ক। পশ্চিমবঙ্গের ঋণগ্রহীতা কম কেন? কারণ শিল্পের জন্য উপযুক্ত জমি পাওয়া কঠিন। জমি লেন-দেনে দুর্নীতি সর্বব্যাপী, রাজনৈতিক দালালি ছাড়া বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন কঠিন, জমি অধিগ্রহণে অনিশ্চয়তা এবং প্রশাসনিক বিলম্ব যেন প্রাতিষ্ঠানিক রোগ। 'ল্যান্ড ব্যাংক' কাগজে আছে, বাস্তবে প্রস্তুত শিল্পভূমি নেই। 'সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স' স্লোগানে আছে, বাস্তবে দশটি দপ্তরে চক্কর কাটতে হয়। এই পরিবেশে ব্যাংক বড়ো ঋণ দিতে চায় না, ফলে শিল্প দাঁড়ায় না, কর্মসংস্থান তৈরি হয় না।

সবচেয়ে বিপজ্জনক অবনমন ঘটেছে নতুন যুগের শিল্প ও উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে। আজ যখন তামিলনাড়ু তথ্যপ্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক যান, প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন এবং জৈবপ্রযুক্তিতে বড়ো বিনিয়োগ টানছে; মহারাষ্ট্র কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্রশিক্ষণ ও আর্থিক প্রযুক্তিতে স্টার্টআপ-পরিকাঠামো গড়ছে; উত্তরপ্রদেশ ও হরিয়ানা কৃষি-প্রযুক্তি ও খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণে শত শত নতুন উদ্যোগকে সরকারি সহায়তায় বড়ো করছে— তখন দেশের আর্থিক বৃদ্ধির এই চিত্রে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত অনুপস্থিত। রাজ্যে কার্যকর ইনকিউবেশন কেন্দ্রের সংখ্যা নগণ্য, সরকার-সমর্থিত ঝুঁকি তহবিল নেই, শিল্প সংযোগ দুর্বল। নতুন যুগের শিল্প যেমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যন্ত্রশিক্ষণ, জৈবপ্রযুক্তি, কৃষিপ্রযুক্তি— এসব ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে বড়ো কোনো শিল্পাঞ্চল বা নীতি কাঠামো তৈরি হয়নি। ফলে মেধা রাজ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিনিয়োগ বাইরে হচ্ছে, ভবিষ্যৎ শিল্পের দৌড়ে পশ্চিমবঙ্গ শুধু পিছিয়েই পড়ছে।

এই একই অবস্থা গ্রামগঞ্জের অর্থনীতিতেও। রাজ্য এখনো অতিরিক্তভাবে নির্ভরশীল ধান-পাট-আলু— কেন্দ্রিক কৃষিতে। যেখানে মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক বা হরিয়ানা ফল, সবজি, উদ্যানপালন, ফুলচাষ ও রপ্তানিমুখী কৃষিকে সামনে এনে কৃষকের প্রকৃত আয় বাড়াতে পেরেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে ফসল বৈচিত্র্যকরণ, কৃষিভিত্তিক প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, শীতলীকরণ পরিকাঠামো এবং বাজারসংযোগ দুর্বলই রয়েছে। কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধির হার কম, গ্রামীণ ক্ষেত্রে ঋণ সমস্যা তীব্র, ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। তৃণমূল শাসনের পনেরো বছরে শিল্প, আর্থিক শৃঙ্খলা, বিনিয়োগ, ব্যাংক ঋণ, কৃষি ও নতুন যুগের পশ্চিমবঙ্গ প্রযুক্তি— প্রতিটি ক্ষেত্রেই জাতীয় মানচিত্রে নিজের গুরুত্ব হারিয়েছে।

এক সময় যে বঙ্গভূমি ছিল গোটা দেশের পথপ্রদর্শক, আজ সে নিজেই পথহারা। এটা রাজনৈতিক স্লোগান নয়— এটা সরকারি পরিসংখ্যানের নির্মম, অবিসংবাদী রায়। □

বর্তমান প্রজন্ম বিবাহবিমুখ কেন?

অরুণা রায় চৌধুরী

সময়ের সঙ্গে সমাজ যেমন পরিবর্তিত হয়, তেমনি সম্পর্ক, বিবাহ প্রতিষ্ঠান ও পারিবারিক কাঠামো নিয়েও মানুষের ধারণায় ব্যাপক রদবদল ঘটে। একসময় বিবাহ ছিল সমাজের অন্যতম প্রধান রীতি— প্রায় বাধ্যতামূলক। কিন্তু বর্তমান প্রজন্মের একটি বড়ো অংশ ক্রমশ বিবাহ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কেউ বিয়ে করছে দেরিতে, কেউ করছে না-ই, আবার কেউ বিবাহের বিকল্প পথ বেছে নিচ্ছে— লিভ-ইন, সিঙ্গল লাইফ বা 'কমিটমেন্ট-ফ্রি' সম্পর্ক। এর পেছনে রয়েছে বহুস্তরীয় সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ। আজকের তরুণেরা সম্পর্ককে আর 'লাস্ট ফর লাইফ' হিসেবে দেখেন না। তারা বিশ্বাস করেন সম্পর্ক মানে দু'জন মানুষের সমানভাবে সুখী থাকা, সম্পর্কের মধ্যে স্বাধীনতা, স্পেস ও স্বচ্ছতা থাকা। দু'জনের লক্ষ্য ও মানসিক মূল্যবোধ মিলতে হবে।

আগের প্রজন্ম যেখানে বিয়ের পর ধীরে ধীরে মানিয়ে নেওয়ার মধ্যে বিশ্বাস করত, বর্তমান প্রজন্ম সম্পর্ক শুরু করার আগেই প্রত্যাশা ও সীমারেখা স্পষ্ট করে দেয়। তাই সম্পর্ক যদি ভালো না চলে, তারা মনে করেন বিয়ে করে জটিলতা বাড়ানোর দরকার নেই। ডিজিটাল যুগে প্রায় সবকিছুই 'ইনস্ট্যান্ট'। খাবার থেকে বিনোদন— সবই হাতের মুঠোয়। এই দ্রুত-ফলাফলের অভ্যেস সম্পর্কেও এসে পড়েছে। ফলে সমস্যার মুখোমুখি হলে ধৈর্য ধরে ঝগড়া মিটিয়ে নেওয়ার প্রবণতা কম। বরং ইগো ক্ল্যাশ বাড়ছে, সমস্যা দেখা দিলেই 'এটা আমার জন্য নয়' বলে সরে যাওয়া সহজ মনে হয় তাদের কাছে।

বিয়ে মানেই আর্থিক দায়বদ্ধতা— বাড়ি, গাড়ি, সন্তান, পারিবারিক খরচ। অনেক তরুণ মনে করেন, নিজেদের ক্যারিয়ার স্থিতিশীল না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে না করাই ভালো। আবার অনেকেই বিশ্বাস করেন— এই অর্থনৈতিক কাঠামোতে তারা সারা জীবন সিঙ্গল থাকাই বেশি সহজ। যে সন্তানরা শৈশবে বাবা-মায়ের বিবাদ বা বিচ্ছেদ দেখেছে, তাদের মধ্যে 'বিয়ে করলে জীবন নষ্ট হতে পারে'— এমন ভয় তৈরি হয়।

মেয়েরা এখন কর্মজীবনে সফল, আর্থিকভাবে স্বনির্ভর এবং নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে পারে। ফলে 'বিয়ে না করলে সমাজে অসম্পূর্ণ'— ধারণা ভেঙে গেছে। বিয়ে না করলেও নিজের জীবন সমৃদ্ধ করার ক্ষমতা রয়েছে। 'স্বামী-নির্ভর জীবন' আর লক্ষ্য নয়। অনেক নারী মনে করেন, বিবাহ করলে তাঁদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত স্বাধীনতা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। সবচেয়ে বড়ো কারণ হলো বিবাহে মানিয়ে নেওয়া, সমন্বয়, সামঞ্জস্য— এসবের জন্য ধৈর্য দরকার যা এই প্রজন্ম তুলনামূলকভাবে কম দেখায় বলে সমাজতত্ত্ববিদদের মত। এছাড়া সোশ্যাল মিডিয়ার দুনিয়ায় সম্পর্ক যেন এক ধরনের 'মার্কেটপ্লেস'।

ডেটিং অ্যাপ, চ্যাটিং প্ল্যাটফর্ম মানুষের মনে এমন ধারণা দেয় 'আরও ভালো কাউকে পাওয়া যেতে পারে।' 'সামান্য সমস্যায় সম্পর্কে ছেড়ে দেওয়া যায়।' 'সম্পর্ককে সহজেই রিপ্লেস করা যায়।' এ ধরনের চিন্তাধারা স্থায়ী সম্পর্কের প্রতি অনীহা তৈরি করে। বর্তমান প্রজন্ম মানসিক স্বাস্থ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি বোঝে। তারা মনে করে যে সম্পর্কে মানসিক শান্তি নেই, সে সম্পর্কের মূল্য নেই। তাছাড়া আগে পরিবার ও সমাজের প্রবল চাপ থাকত 'বিয়ে করতেই হবে', 'বয়স হয়ে যাচ্ছে', 'সমাজ কী বলবে?' কিন্তু এখন চাই চাপ তুলনামূলক কম। পরিবারও তুলনামূলক উদার।

সবশেষে বলা যায় বর্তমান প্রজন্মের বিবাহবিমুখতার পেছনে কোনো একক কারণ নেই— বরং বহুস্তরীয় সামাজিক, মনস্তাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাব এটা। আজকের পরিবর্তিত সমাজে বিবাহ একটি 'পছন্দ', 'বাধ্যবাধকতা' নয়— এই ধারণাই নতুন প্রজন্মের বিবাহ নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গিকে গড়ে তুলেছে। □

অ্যালার্জির সমস্যা ও প্রতিরোধ

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

অ্যালার্জি অনেকেরই থাকে। কারও বেগুনে, কারও ফুলের রেণুতে, আবার কারও ধুলোতে। সাধারণভাবে এগুলো এড়িয়ে চললেই হলো, তা হলে আর চিন্তার কোনো কারণ থাকে না। কিন্তু অনেকটা হার্ট অ্যাটাক বা ব্রেন স্ট্রোকের মতো এক বিশেষ রকম অ্যালার্জি আছে যা শুধু জীবনসংশয় ডেকে আনতে পারে তা নয়, অ্যালার্জি শুরু হওয়ার পর দশ মিনিটের থেকেও কম সময়ের মধ্যে রোগীর মৃত্যুও হয়ে যেতে পারে। এই ভয়াবহ সমস্যার নাম অ্যানাফাইলাক্সিস।

আরও সহজ হবে বুঝতে, আমরা মাঝে মধ্যেই শুনে থাকি সমুদ্র সৈকতে ঘুরতে গিয়ে হঠাৎ করেই মৃত্যু হয়েছে। কারণ কাঁকড়া কিংবা চিংড়ি খেয়ে বিপত্তি। এই ধরনের আচমকা বিপত্তির মূলে রয়েছে অ্যালার্জির ভয়ানক রূপ। যাকে চিকিৎসার পরিভাষায় বলা হয় অ্যানাফাইল্যাক্টিক শক।

ঠিক কী হয়?

সাধারণত যে সব থেকে অ্যালার্জি প্রকাশ পায় সেগুলিকে বলে অ্যালার্জেন। অ্যালাফাইল্যাক্টিক কিন্তু যাঁদের আগে কোনো দিন কোনো রকম অ্যালার্জি হয়নি তাঁদেরও হতে পারে। ঠিক কোন কোন অ্যালার্জেন্স থেকে এই সমস্যার ঝুঁকি বেশি?

- **খাদ্য :** সামুদ্রিক খোলসযুক্ত মাছ বা প্রাণী (চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি), চিনে বাদাম।
- **ওষুধ :** অ্যান্টিবায়োটিক (পেনিসিলিন, টেট্রাসাইক্লিন, অ্যামক্সিসিলিন ইত্যাদি), নন স্টেরয়েডল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগ (এক রকমের ব্যথার ওষুধ), সালফার ড্রাগ (ওষুধ) পেট খারাপের ওষুধ, লিডোকেন (অসাড় করে ব্যথা কমানোর মলম/স্প্রে/জেল)।
- **বিষাক্ত পোকা বা প্রাণীর কামড় :** বোলতা, মৌমাছি, ভিমরুল, কাঁকড়া বিছে, তেঁতুলে বিছে ইত্যাদি।
- **রং :** কৃত্রিম রাসায়নিক রং যা খাবারে ব্যবহৃত হয়, চুলের ডাই ইত্যাদি।

- **ল্যাটেক্স :** রাবারের গ্লাভস, বেলুন, কিছু জামাকাপড় বা কন্ডোমে এই উপাদান থাকে।

অ্যালার্জির ধাত থাকলে, এই বাড়াবাড়ি হবে?

শরীরে অ্যালার্জেন্সের প্রকোপ ঘটলেই যে তার ফলে অ্যালার্জি হবে তা নয়। প্রথমে হালকা অস্বস্তি থাকতে পারে। রোগীর শরীর বুঝতে পারে যে এটা সে গ্রহণ করতে পারছে না। ধীরে ধীরে সহ্যের সীমা ছাড়ায়। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বারে অ্যানাফাইলাক্সিস প্রকাশ পেতে পারে। তীব্রতর হলে ব্যক্তি অ্যানাফাইল্যাক্টিক শকে (নাড়ির স্পন্দন পাওয়া যায় না, ব্লাডপ্রেশার মাপা যায় না) চলে যেতে পারেন। তবে যদি অ্যালার্জেনের পরিমাণ বেশি হয়, স্বাভাবিকভাবেই শরীরে প্রভাবটাও বেশি হবে। প্রথমবার অ্যালার্জেন্স শরীরে প্রবেশ করলেই তা থেকে সমস্যা ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে।

কীভাবে লক্ষণ প্রকাশ পায়?

সারা গায়ে আমবাতের মতো লাল হয়ে চুলকানি শুরু হয়। চোখ, ঠোঁট আর জিভ ফুলে ওঠে। গলার ভেতরটাও ফোলে, স্বর পালটে যায় (কর্কশ স্বর হয়ে যাবে), নিশ্বাস নিতে কষ্ট শুরু হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বেড়ে যাবে। ঢোক গিলতে অসুবিধা হবে, গলাটা ভারি হয়ে আসবে। কাশি হতে পারে। শ্বাস-প্রশ্বাসে স্ট্রাডার (সোঁ-সোঁ বা ঘড়ঘড়ানি শব্দ অন্যরা শুনতে পারেন), ক্লান্তিবোধ, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে, বিভ্রান্ত হয়ে যেতে পারেন ও রোগী জ্ঞান হারিয়ে ফেলতে পারেন।

একদম শিশুদের ক্ষেত্রে উপরোক্ত লক্ষণগুলি ছাড়াও দেখতে হবে তার চোখ, কান, গলা চুলকাচ্ছে কিনা, নাকের ফুটোগুলি বড়ো হয়ে যাবে, ত্বকে একরকম জালি জালি ভাব নজরে আসবে, কান্নাকাটি কিছুতেই বন্ধ হবে না। এমন হলে সতর্ক হতে হবে।

প্রতিরোধে :

এই ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইলে কয়েকটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে। প্রথমেই জানুন, অ্যানাফাইল্যাক্সিস কী, তার লক্ষণ কী? কীসে হতে পারে— যেমন খাবার, ওষুধ, পোকামাকড়ের কামড় ইত্যাদি। আপনার কি কিছুতে অ্যালার্জি আছে? অ্যালার্জি টেস্ট করিয়ে সেটা জেনে রাখুন। এমন হলে কী করবেন।

এক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি সতর্কতা :

কোনো খাবার বা ওষুধ নেওয়ার পর অস্বস্তি, জ্বালা বা চুলকানি হলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি খাওয়া বা নেওয়া বন্ধ করুন।

সঙ্গে রাখুন জরুরি ওষুধ :

- অ্যান্টি-অ্যালার্জিক বা অ্যান্টি হিস্টামিন (অ্যাভিল/অ্যালেগ্রা/অ্যাটারেক্স), স্টেরয়েড (ওয়াইসোলোন/প্রেডনিসোলোন)। প্রয়োজনে লক্ষণ দেখা দিলেই খেয়ে নিন।
- এপিনেফ্রিন বা অ্যাড্রেনালিন ইনজেকশন (এপিপেন) : অ্যানাফাইল্যাক্সিসের একমাত্র কার্যকর চিকিৎসা। বাড়িতে ফ্রিজে রাখুন, বাইরে গেলে কোল্ড বক্সে। এই ইনজেকশন উরুর বাইরের দিকে বা পেটে নিতে হয়।

পরিস্থিতি জটিল হলে, অথবা বুঝতে না পারলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। হাসপাতালে যাওয়া আগে রোগীকে পায়ের দিক উঁচু করে শুইয়ে দিন। এপিপেন না থাকলে অ্যাড্রেনালিন ও অ্যান্টি-অ্যালার্জিক ইনজেকশনের ব্যবস্থা করুন। ❐

বাবরি মসজিদের শিলান্যাস এই রাজ্যের জন্য ভয়াবহ হতে চলেছে

তারক সাহা

গত ৬ ডিসেম্বর দিনটিতে তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের দ্বারা বাবরি মসজিদের শিলান্যাস এই রাজ্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি করল। আজ থেকে ৩৩ বছর আগের অযোধ্যায় বিতর্কিত ধাঁচা ভাঙার স্মৃতিকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা হলো সাধারণ মুসলমানদের মনে। ২০২৫-এ দাঁড়িয়ে অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির হলো একটি 'সেটলড্ ফ্যাক্ট' এবং সেখান থেকে অপসারিত সেই কলঙ্কিত ধাঁচার ব্যাপারে খুঁচিয়ে ঘা তৈরি করা হলো পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের এক গভীর চক্রান্ত। মুর্শিদাবাদের এই বিধায়ক বেশ কয়েক বছর ধরেই সংবাদ শিরোনামে। এর আগে অঙ্কের অনুপাত হাজির করে মুর্শিদাবাদে মুসলমান ও হিন্দুদের জনসংখ্যার একটি হিসাব দিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, মুসলমানরা এই জেলায় ৭০ শতাংশ, হিন্দুরা হলো ৩০ শতাংশ এবং মুসলমানরা হিন্দুদের কেটে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিতে পারে। তার এই বিষাক্ত বক্তব্য নিয়ে বিভিন্ন মিডিয়ায় যথেষ্ট হইচই হলেও হুমায়ুন যে দলের সম্পদ, সেই দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মুখে কার্যত কুলুপ এঁটে ছিলেন; যেমনটি কুলুপ এঁটে ছিলেন তার একদম কাছের মানুষ ফিরহাদ হাকিমের সমস্ত অমুসলমানদের দাওয়াত-এ-ইসলামের সেই ঐতিহাসিক আবাহনে। ফিরহাদ হাকিম এও বলেন যে, যারা মুসলমান হয়ে জন্মাননি, তারা অভাগা। তার এহেন সাম্প্রদায়িক মন্তব্য দলকে যথেষ্ট বিড়ম্বনায় ফেললেও ফিরহাদকে ন্যূনতম সতর্কও করেনি তৃণমূল দল। হুমায়ুনের বাবরি মসজিদের শিলান্যাস নিয়ে বিতর্ক তৈরি হওয়ায় রীতিমতো একটি নাটক মঞ্চস্থ হলো বহরমপুরের এক জনসভায়। আমন্ত্রিত হয়ে হুমায়ুন সেখানে উপস্থিত হয়ে সাংবাদিকদের কাছে তার সাসপেনশনের বার্তা পেয়েই সভাস্থল ছাড়েন

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর কাছে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টি সবচেয়ে বড়ো; তার কাছে রাজ্যের স্বার্থ বড়ো নয়। ... কিন্তু হুমায়ুন কবির যে 'কিংমেকার' হতে চান সংবাদমাধ্যমে সেকথা সোজাসাপটা বলেই দিয়েছেন হুমায়ুন।

এবং এরপরই শুরু হয় তার হুঙ্কার, তিনি দিতে থাকে নতুন দল গঠনের বার্তা এবং কতগুলি আসনে লড়বে সেই নতুন দল, কাদের সঙ্গে জোট বেঁধে সেই দল লড়বে ২০২৬-এর রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন ইত্যাদি ইত্যাদি।

অনেকেই জানেন যে, বিভিন্ন সময়ে তৃণমূলনেত্রীর নিজেরই তৈরি করা চিত্রনাট্য দিয়ে রাজনৈতিক 'নাটক' মঞ্চস্থ করা কোনো বিরল ঘটনা নয়। যেমনটি করেছিলেন ২০২১ সালের রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক আগে। সেটি ছিল--- পা ভাঙার নাটক। নির্বাচনের ফল ঘোষণার আগে পর্যন্ত হুইলচেয়ারে চেপে, পায়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে তিনি ঘুরেছেন এবং ফল ঘোষণার পরই তিনি একদম ফিট। হুমায়ুনকে সাসপেনশনের বার্তা পাঠানো হয়েছিল ফিরহাদ হাকিমের মাধ্যমে এবং এটাকেই 'নাটক' বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। কারণ বিষয়টি যদি এতটাই জরুরি ছিল এবং দল যদি তাকে সাসপেন্ড করা নিয়ে সত্যিই সিরিয়াস হতো, তবে সভামঞ্চ থেকেই মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী স্বয়ং সেই সাসপেনশনের বার্তা দিতেন। একের পর এক বিষাক্ত বক্তব্য তুলে ধরা হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার পরিবর্তে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করতেন। কিন্তু সেই পথে না হেঁটে তিনি ফিরহাদের মাধ্যমে কাজটি সারলেন।

হুমায়ুনের বাবরি শিলান্যাসের পর তার বিভিন্ন কার্যকলাপ বেশ সন্দেহজনক ঠেকছে। সেগুলি হলো— সাসপেন্ড হওয়ার পর হুমায়ুন বলেছিলেন এই মাসের ২৭ তারিখে বিধায়ক পদ থেকে তিনি ইস্তফা দেবেন। শেষমেশ জনগণের দোহাই দিয়ে তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি তিনি ফিরিয়ে নিলেন এবং কার্যত ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ঘোষণা করলেন যে, সাসপেন্ডেড হলেও তৃণমূলের বিধায়ক হয়েই বাকি সময়টা তিনি কাটিয়ে দেবেন। টেলিভিশনের একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলের অনুষ্ঠানে তার উদ্দেশে 'হিন্দুদের কেটে ভাসিয়ে দেওয়ার' প্রশ্ন উঠতেই হুমায়ুন তার কোনো উত্তর না দিয়ে এই প্রশ্নটিই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করতে বলেন।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে, তাহলে কী মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্রয়েই হুমায়ুনের এই উক্তি? যদিও এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কোনো প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

হুমায়ুনের শিলান্যাসের বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা হলেও তা খারিজ হয়ে যায়। ভারতীয় সংবিধানের ২৯ নং অনুচ্ছেদ মেনে মসজিদের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করে কলকাতা হাইকোর্ট; কিন্তু মসজিদের নাম কী হবে সেটা আদালতের বিচার্য নয় বলে এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেনি উচ্চ আদালত। কিন্তু এই শিলান্যাস অনুষ্ঠান এবং মসজিদ নির্মাণ বেশ কয়েকটি কারণে রাজ্যের পক্ষে বিপজ্জনক। (১) শোনা যাচ্ছে যে, এই মসজিদ নির্মাণে বহু কোটি টাকা দিয়ে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলেছে মসজিদ নির্মাণের ট্রাস্ট। বিভিন্ন আরব দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা আসবে বলে আহ্লাদিত হুমায়ুন। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন যে, এই মসজিদ নির্মাণ তাকে ইতিহাসে ঠাঁই করে দিয়েছে। তবে কেন এই মসজিদ নির্মিত হচ্ছে বহিরাগত, আক্রমণকারী বাবরের নামে? আকবর বা অন্য মুঘল শাসকদের নামেই বা নয় কেন? এর কারণ পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং এতে নিশ্চিতভাবে পরোক্ষে সায় রয়েছে রাজ্য প্রশাসনের। (২) হিন্দুদের মধ্যে এই ধরনের বিতর্কে বুদ্ধিজীবীরা আড়াআড়িভাবে বিভক্ত হয়ে যায়, অথচ তৃণমূলের আরেক হুমায়ুন কবির, যিনি প্রাক্তন আইপিএস এবং বর্তমানে বিধায়ক— একজন বুদ্ধিজীবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সমর্থন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের বুকে বাবরি মসজিদের শিলান্যাস। যেকোনো মুসলমান যে ইমান রক্ষায় তৎপর এবং তার সম্প্রদায়ের বাকিদের সঙ্গে এই ব্যাপারে এককাট্টা— মসজিদ ইস্যুতে মুর্শিদাবাদের হুমায়ুনকে সমর্থন দানের মাধ্যমে এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন ডেবরার তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির। মসজিদের শিলান্যাস, এমনকী নামকরণেও তার কোনো আপত্তি নেই।

তবে এই দুই হুমায়ুন কেন মসজিদ নির্মাণে সহমর্মিতা প্রকাশ করছেন? এর কারণ খুব স্পষ্ট। কারণ বাবরের নামে মসজিদ হলে অর্থ সংগ্রহ হবে সারা বিশ্ব জুড়ে। ৩৩ বছর আগের ঘটনা দেশের মুসলমান জনমানসে যতটা প্রভাব ফেলেছে, অন্য কোনো ঘটনা হয়তো ততখানি প্রভাব ফেলতে পারেনি বলে হুমায়ুনের মতো বিষাক্ত, সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকদের ধারণা। তাই দুনিয়ার মুসলমান সমাজের সমর্থন আদায় এবং রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুসলমান ভোটের মেরুকরণ— বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের মাধ্যমে এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল নিয়েছেন রাজ্যের এই মুসলমান রাজনীতিকরা।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রীর কাছে রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতির বিষয়টি সবচেয়ে বড়ো; তার কাছে রাজ্যের স্বার্থ বড়ো নয়। তাই বাবরি মসজিদের শিলান্যাস থেকে নির্মাণপর্ব— প্রতিটি ক্ষেত্রে একটা প্রচ্ছন্ন সমর্থন রয়েছে রাজ্য প্রশাসনের। দেওয়াল লিখন পড়তে পারছেন তৃণমূলনেত্রী। শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি-সহ গত ১৪ বছরে রাজ্যে 'দুর্নীতি' যে ব্যাপক, প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করেছে, তাতে আগামী ভোটে একশো শতাংশ মুসলমান সমর্থন হয়তো তার দলের ঝুলিতে আসবে না। রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে বৈধ ও অবৈধ— দু'প্রকার প্রার্থী রয়েছে এবং সবার চাকরি বাতিল হওয়ায় এই দুই প্রকারই সমানভাবে প্রভাবিত। তাই এদের এবং এদের পরিবারের ভোট তৃণমূলের ঝুলিতে না যাওয়ার সম্ভাবনা। সেই জন্য বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে যে, হুমায়ুনকে সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত তৃণমূলের গট আপ গেম নয়তো? এর পিছনে হয়তো আরও যুক্তিগ্রাহ্য কারণ লুকিয়ে রয়েছে। বহরমপুরের সভা থেকে হুমায়ুনকে সাসপেন্ড করার ঘটনায় তৃণমূলের পক্ষ থেকে হিন্দুদের হয়তো বার্তা দেওয়া হলো যে দরকার হলে হুমায়ুনকেও ছাঁটতে পিছপা নয় দল। এছাড়া দীঘায় শ্রীজগন্নাথের নামে মন্দির নয় একটি কমপ্লেক্স নির্মাণ এগুলি তো রয়েছেই। হিন্দুদের পাশে থাকার নাটক এভাবেই করে চলেছেন তৃণমূলনেত্রী।

সংবাদমাধ্যমে তার মনোভাব লুকোছাপা না করে পুরোপুরি ব্যক্ত করেছেন হুমায়ুন। ২২ ডিসেম্বর প্রকাশ্য সভায় নতুন দল তৈরি করবেন বলে তিনি জানিয়েছেন। সেই সভায় চার লক্ষের বেশি মুসলমান জমায়েত হবে বলে তার দাবি। নতুন দল গঠন করে রাজ্যের ১৩৬টি বিধানসভা আসনে লড়াইয়ে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তিনি বলছেন, কোথায় লেখা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে যে আরেকখানা বাবরি মসজিদ করা যাবে না? নতুন দল গঠনের পর সিপিএম-কংগ্রেস- আইএসএফ-মিম-এর সঙ্গে জোট গঠন, আসন সমঝোতা করতে পারেন বলেও জানাচ্ছেন তিনি। ৬০-৬৫টি আসন পেলেই দর কষাকষির জায়গায় পৌঁছে যাবে তার দল। একটা পরিস্থিতি কল্পনা করা যাক। ২০২৬-এর নির্বাচনে রাজ্যে একটি হাং বা ত্রিশঙ্কু বিধানসভা হলো। এক্ষেত্রে তৃণমূল যদি ১৪৭-এর কম আসন পায়, হুমায়ুনের দল যদি মুসলমান অধ্যুষিত আসনগুলির মধ্যে ৫০-৬০টি আসন পেয়ে যায় এবং ভোট কাটাকাটির খেলায় বাম-কংগ্রেস যদি কোনো আসনে কোনোভাবে জিততে সক্ষম হয়, তবে এরকম সম্ভাবনাময় পরিস্থিতিতে হুমায়ুনের দল 'কিংমেকার' হয়ে উঠবে। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে হুমায়ুন নিশ্চিতভাবে তৃণমূলের হাত ধরে জোট সরকার গড়বে এবং তৃণমূলের ওপর রাজ্য ক্যাবিনেটে মুসলমান মন্ত্রী নেওয়ার চাপ বাড়াবে। এছাড়াও আরও একটি সম্ভাবনা রয়েছে। হুমায়ুনের দল হয়তো আবার মিলে যেতে পারে তৃণমূলে। সুতরাং যে পরিস্থিতিই হোক না কেন, ত্রিশঙ্কু বিধানসভায় সরাসরি রাজ্য সরকারি নীতি নির্ধারণী বিষয়ে প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হবেন হুমায়ুন। তিনি যে 'কিংমেকার' হতে চান, সংবাদমাধ্যমে সেকথা সোজাসাপটা বলেই দিয়েছেন হুমায়ুন। রাজ্যের জন্য এই বিষয়টি কিন্তু ভয়াবহ। অনেকটা খাল কেটে কুমির আনার মতো। কুমির না হয় খাল বেয়ে এলো, কিন্তু ডাঙ্গায় তো কুমিরকে উঠতে দিলে চলবে না। এর জন্য অস্ত্র কী? ২০২৬-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে সরকার পরিবর্তন করতেই হবে। দুর্নীতিগ্রস্ত, বিশ্বাসঘাতক, দেশবিরোধী, সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে পরাস্ত করতে বুলেট নয়, ব্যালট হোক রাজ্যবাসীর হাতিয়ার। সত্যিকারের গণতন্ত্রে এটা কোনো অলীক কল্পনা নয়। রাজ্যকে বাঁচাতে একে বাস্তবে রূপ দেওয়াই হোক পশ্চিমবঙ্গবাসীর সংকল্প। □

শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবারের শ্রদ্ধা নিবেদন

গত ৮ নভেম্বর শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবারের উদ্যোগে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মাদপুরের নিকট অভিরামপুর গ্রামের বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রদ্ধেয় গৌরহরি দত্ত মহাশয়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সহস্র পূর্ণচন্দ্র দর্শনকারী শ্রীদত্তকে মাধবরূপে পূজা করে পাদ্য-অর্ঘ্য ও বস্ত্র প্রদান করেন শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবরের গৌতম সেন এবং তাঁর হাতে শ্রীমদভগবদ্গীতা তুলে দেন বিশিষ্ট সমাজসেবী রজত

রায়। পরিবরের পক্ষ থেকে তাঁর ভাই নিত্যানন্দ দত্ত তাঁর অগ্রজ, পৌত্রী তার পিতামহের কর্মময় জীবনের কথা তুলে ধরেন। এছাৱাও পরিবারের তপন দত্ত, রতন দত্ত, স্বপন দত্ত, কিঙ্কর দত্ত তাঁদের অনুভব ব্যক্ত করেন। গীতার শ্লোক আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করে নাতি শৌর্য ও নাতনি রাধারানি। মানপত্র পাঠ করে গৌরবাবুর হাতে তুলে দেন শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবারের অন্যতম সদস্য তথা খড়্গপুর আইআইটি-র অধ্যাপক মৃণাল মণ্ডল।

সমাজসেবী শ্রীদত্ত ১৯৭৫ সালে দেশে জরুরি অবস্থার প্রতিবাদে কারাবরণ করে অমানুষিক অত্যাচরের স্বীকার হয়েছিলেন। তিনি প্রখর বাগ্মী। ৬৫ স্থানে রামায়ণ ও মহাভারতের ওপর প্রবচন রেখেছেন। শ্রদ্ধার্ঘ্য পরিবারের অশোক কমির পড়িয়া বলেন, এটি তাদের ২৫তম অনুষ্ঠান। আগামী ২০২৬ সালে এরূপ ১০০ জনকে শ্রদ্ধা নিবেদনের পরিকল্পনা রয়েছে। মাদপুরের অভিরামপুরের এই অনুষ্ঠানে এলাকার বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন। শ্রদ্ধার্ঘ্যর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠানে ১০০ জনকে গীতা দান করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রদ্ধার্ঘ্যের সহ সভাপতি বিশ্বম্ভর ঘোষ। কল্যাণ মন্ত্রের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

আলিপুরদুয়ার চা-বাগান ক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাদ্যযন্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠান

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে গত ৯ ডিসেম্বর আলিপুরদুয়ার চা-বাগান ক্ষেত্রের সৎসঙ্গে বাদ্যযন্ত্র সমর্পণের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় হাসিমারা গুরুদ্বারায়। অনুষ্ঠানে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র চা-বাগান ক্ষেত্রের সংস্কৃতিপ্রেমী জনজাতি সমাজের মানুষদের হাতে সমর্পণ করেন মহামণ্ডলেশ্বর সাধ্বী ধ্যানমূর্তি মাতাজী। তিনি উপস্থিত জনজাতি সমাজের মানুষদের উদ্দেশে আশীর্বচন দান করে নেশামুক্ত সমাজ গঠনের কথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শ্যামজী শর্মা, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কোষাধ্যক্ষ ধীরেন সরকার, প্রান্ত সংগঠন সম্পাদর অনুপ কুমার মণ্ডল, প্রান্ত সৎসঙ্গ প্রমুখ প্রদীপ থাপা, দুর্গাবাহিনীর প্রান্ত সংযোজিকা শ্রীমতী সরস্বতী রাজগর।

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদ্‌যাপন

সক্ষম দক্ষিমবঙ্গে প্রান্তর উদ্যোগে বিভিন্ন জেলায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালিত হয়। কালকাতা জেলার কার্যক্রম কার্যক্রম বিধান নগরের স্বস্তয়ন দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২০ জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। এখানে ৩৫ জন উপস্থিত ছিলেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার আনন্দ নিকেতন দিব্যাঙ্গ বিদ্যালয়ে ৭০ জন দিব্যাঙ্গ ভাই-বোন এবং তাদের অভিভাবকরা প্রভাতফেরির পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মিলিত হন। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার কার্যক্রম গীতা যোগ ট্রাস্ট আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। ৯জন দিব্যাঙ্গজন-সহ ২১ জন অংশগ্রহণ করেন। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই নগরের কার্যক্রমে দিব্যাঙ্গজন বন্ধুদের সঙ্গে বহু স্থানীয় মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরের বাঁকাদহে কর্মযোগী সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে জনজাতি ছাত্রাবাস 'মা সারদা সেবা ভবন' নির্মাণান্তে গত ১১ ডিসেম্বর শুভ দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কর্যকারিণীর সদস্য সুনীলপদ গোস্বামী, অদ্বৈতচরণ দত্ত, পূর্বক্ষেত্রের সহ ক্ষেত্র প্রচারক জলধর মাহাত, ক্ষেত্র বৌদ্ধিক প্রমুখ বলরাম দাসরায়, সনৎ কুমার বসু মল্লিক, প্রিয়ব্রত সরকার প্রমুখ।

মালদা নগরে সামাজিক সদ্ভাব বৈঠক

গত ২৫ নভেম্বর মালদহ নগরের ললিত মোহিনী শ্যামমোহিনী উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পালিত হলো সামাজিক সদ্ভাব বৈঠক। বৈঠকে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে ৩৩জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণী মণ্ডলের আমন্ত্রিত সদস্য অদ্বৈতচরণ দত্ত। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ সহ-প্রান্ত প্রচারক সিদ্ধার্থ রায়চৌধুরী, প্রান্ত কার্যকারিণীর সদস্য প্রবীর কুমার মিত্র, মালদা বিভাগ সঙ্ঘচালক পীযূষকান্তি সাহা, বিভাগ প্রচারক অধীন সিংহ, জেলা প্রচারক কৌশিক রুদ্র-সহ বহু কার্যকর্তা। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংস্কার ভারতীর পরেশচন্দ্র সরকার, সজল দত্ত ও শ্যামল কুণ্ডু সমবেত কণ্ঠে 'ধনধান্যপুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' গানটি পরিবেশন করেন। এরপর উপস্থিত অতিথিরা ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্প নিবেদন ও প্রদীপ প্রজ্বলন করেন। শ্রীদত্ত সামাজিক সদ্ভাব বিষয়ে এবং সঙ্ঘের পঞ্চ পরিবর্তন বিষয়ে মনোজ্ঞ ভাষণ রাখেন। বৈঠক পরিচালনা করেন প্রসেনজিৎ সরকার।

কার্যক্রম সুসম্পন্ন করতে সক্রিয় সহযোগিতা করেন জেলা সদ্ভাব প্রমুখ প্রিয়ব্রত মালাকার, মালদা নগর টোলি প্রমুখ শম্ভু চৌধুরী এবং সহ-টোলি প্রমুখ কানাই চৌধুরী।

শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয়ের গীতাজয়ন্তী উদ্যাপন

গত ৪ ডিসেম্বর শ্রী বড়াবাজার কুমারসভা পুস্তকালয় তাদের নবনির্মিত কার্যালয়ে গীতাজয়ন্তী উদ্যাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট হিন্দি সাহিত্যিক ডঃ তারা দুগড়। তিনি তাঁর ভাষণে গীতাকে মানুষের ব্যবহারিক জীবনের বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করে বলেন, গীতা মনুষ্যমাত্রেরই পথপ্রদর্শনকারী সার্বভৌম গ্রন্থ। উপস্থিত ছিলেন শ্রীযোগেশরাজ উপাধ্যায়, ডঃ কমল কুমার, সমাজসেবী যশবন্ত সিংহ। পুস্তকালয়ের মন্ত্রী বংশীধর শর্মা স্বরচিত কাবিতার মাধ্যমে গীতাসার বর্ণনা করেন। কবি হীরালাল জয়সোয়াল ও কবি আলোক চৌধরী তাঁদের কবিতার মাধ্যমে গীতামাহাত্ম্য তুলে ধরেন। বিশিষ্ট গায়ক সত্যনারায়ণ তিওয়াড়ী ভজন পরিবেশন করেন।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মহাবীর বজাজ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভগীরথ সারস্বত। অনুষ্ঠানে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন।

Today's Choice.....
Vandana
SAREES • SUITS • BEDSHEETS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidory
Sarees & Bedsheets (Always Exclusive)
Cont. No. 033-2270 0476, 9432290475

ফ ঃ ৪

ভারত সভায় বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ১৩৭তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

অত্যাচারী ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে বোমা নিক্ষেপ করে হত্যার উদ্দেশ্যে ১৯০৮ সালের ৩০ এপ্রিল মজঃফরপুরে পৌঁছে গিয়েছিলেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু। যুগান্তর দলের বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের বগুড়ায় শিবগঞ্জে ১৮৮৮ সালের ১০ ডিসেম্বর। কিংসফোর্ডের গাড়ি লক্ষ্য করে তাঁরা বোমা নিক্ষেপ করলেও তাঁদের নিজ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। পরে মোকামা স্টেশনে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে তিনি ধরা পড়েন। পুলিশ তাঁকে গুলি করে হত্যা করে এবং মৃত্যুর পর তাঁর মস্তকছেদন করে। তিনি হলেন ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রথম বীরগতিপ্রাপ্ত বিপ্লবী। ফাঁসিকাঠে প্রাণ বিসর্জন করেন বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু। গত ৯ ডিসেম্বর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ১৫০ বছরের প্রাচীন, ঐতিহাসিক ভারত সভায় উদ্‌যাপিত হয় বরেণ্য বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর ১৩৭তম জন্মদিবস। বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের উদ্যোগে এবং তুহিনা প্রকাশনীর সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর প্রপৌত্র সুব্রত চাকী, বিশিষ্ট লেখক তথা বিচারক বিপ্লব রায়, বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যা মিঠু চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট লেখক শুভেন্দু মজুমদার। বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের পর এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন বিপ্লব রায় এবং বক্তা ছিলেন শুভেন্দু মজুমদার, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক পল্লব মিত্র এবং 'সুখবর' পত্রিকার সম্পাদক শমীক স্বপন ঘোষ। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিপ্লবী তারকনাথ মিত্রর পরিবারের সদস্য পাপিয়া মিত্র। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বক্তারা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর জীবন ও আদর্শ। অতিথিদের বক্তব্য শেষ হলে অনুষ্ঠানমঞ্চ হতে বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকীর সংক্ষিপ্ত জীবনী সংবলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। পুস্তিকাটির লেখিকা হলেন সর্বাণী মুখোপাধ্যায়। এরপর 'বাচিক শৈলী'র দ্বারা পরিবেশিত হয় একটি গীতিআলেখ্য 'বন্দে মাতরম্'। এরপর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের প্রতিনিধি এবং বিশিষ্টজনদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। যাঁদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়, তাঁরা হলেন— বিপ্লবী শক্তিপদ মল্লিকের পরিবারের সদস্য ড. দেবপ্রিয় মল্লিক, বিপ্লবী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়ের পরিবারের সদস্য মৃণালকান্তি রায়, বিপ্লবী প্রফুল্ল কুমার সেনের পরিবারের সদস্যা ড. পূরবী সেন, বিপ্লবী দেবকুমার ঘোষের পরিবারের সদস্যা মিতালী সরকার, বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের পরিবারের সদস্যা রমা রায়, বিপ্লবী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের পরিবারের সদস্য অধীশ ভট্টাচার্য্য, বিপ্লবী হৃষীকেশ চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যা মিঠু চক্রবর্তী, বিপ্লবী ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্য শিলাজিৎ চক্রবর্তী, বিপ্লবী দেবেশচন্দ্র কুণ্ডুর পরিবারের সদস্য সুবীর কুমার কুণ্ডু, বিপ্লবী নিরঞ্জন মালাকারের পরিবারের সদস্য রতিকান্ত মালাকার, বিপ্লবী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর পরিবারের সদস্যা, কবি ও উপস্থাপিকা দীপশিখা চৌধুরী, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরিবারের সদস্য অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী বীর গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাতি শান্তনু মুখোপাধ্যায়, বিপ্লবী কালীপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর পরিবারের সদস্যা কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাসের পরিবারের সদস্য তরুণ বিশ্বাস, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পরিবারের সদস্য প্রসাদরঞ্জন দাশ, বিপ্লবী তারকনাথ মিত্রর পরিবারের সদস্য অতনু মিত্র, বিপ্লবী বসন্ত ঢেঁকীর পরিবারের সদস্য অনিন্দ্য দাশ, সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্য জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আইএনএ সিক্রেট সার্ভিসের সদস্য সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, যুবক সন্ন্যাসী রাজমোহন বৈরাগী এবং 'মৃত্যুঞ্জয়ী প্রফুল্ল চাকী' সিনেমার পরিচালক অমৃতম মণ্ডল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কর্ণধার সুব্রত চাকী। সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'-র মধ্য দিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দীপশিখা চৌধুরী।

মহাজাতি সদনে বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ১২০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ৭ ডিসেম্বর কলকাতায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত মহাজাতি সদনে বঙ্গীয় সাহা সমিতি, চট্টগ্রাম পরিষদ ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির উদ্যোগে ভারত জননীর বীর সন্তান বিপ্লবী গোপীনাথ সাহার ১২০তম জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে বীরগতিপ্রাপ্ত এই বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁর অবদান স্মরণ করেন বঙ্গীয় সাহা সমিতির সম্পাদক সুবীর সাহা, সমিতির সভাপতি বিকাশ বিশ্বাস, কোষাধ্যক্ষ আশিস সাহা, চট্টগ্রাম পরিষদের সহ-সম্পাদক প্রদীপ কুমার দত্ত ও বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস-সহ বহু বিশিষ্টজন। এছাড়াও বিপ্লবীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন বঙ্গীয় সাহা সমিতির বহু সদস্য, সদস্যা এবং কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী। অগ্নিযুগের এই বিপ্লবী সম্পর্কে বক্তারা বলেন যে, ১৯০৫ সালের ৭ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন গোপীনাথ সাহা। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিদ্যালয় ত্যাগ করে তিনি ক্রমে হুগলী বিদ্যামন্দির, কলকাতা শ্রীসরসস্বতী লাইব্রেরি ও শ্রীসরস্বতী প্রেস, দৌলতপুর সত্যাশ্রম, বরিশাল শঙ্কর মঠ, উত্তরপাড়া বিদ্যাপীঠ, তরুণ-বিপ্লবী দল প্রভৃতি বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কলকাতার অত্যাচারী পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে ১৯২৪ সালের ১২ জানুয়ারি চৌরঙ্গী অঞ্চলে টেগার্ট ভ্রমে আর্নেস্ট ডে'কে হত্যা করেন গোপীনাথ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই ঘটনা 'চৌরঙ্গী হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত। গ্রেপ্তারের পর তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে অস্বীকৃত হন এবং 'টেগার্ট হত্যাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল'— এ কথা স্বীকার করে ফাঁসিতে মৃত্যুবরণ করেন। ওইদিন দেশের সর্বত্র শোকসভা হয়। তাঁর মৃতদেহ নিয়ে শোকযাত্রা করার অপরাধে গ্রেপ্তারি বরণ করেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র, বিপিনবিহারী গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদারের মতো দেশবরেণ্য নেতারা। এদিন সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বঙ্গীয় সাহা সমিতির সম্পাদক সুবীর সাহা।

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ১৪৬তম জন্মদিবস উদ্‌যাপন

গত ৭ ডিসেম্বর মধ্য কলকাতা-স্থিত বিপ্লবতীর্থ মলঙ্গা লেনে জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতি ও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের উদ্যোগে উদ্‌যাপিত হয় বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)-এর ১৪৬তম জন্মদিবস। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় আর্তত্রাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মুখোপাধ্যায়, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সাধারণ সম্পাদক অনিমিত্র চক্রবর্তী, বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের সদস্য মৈনাক চক্রবর্তী, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায় এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়। ১৮৭৯ সালের ৮ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণকারী বিপ্লবী নেতা এবং বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর দলের প্রথম সারির নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করেন। তাঁর বিপ্লবী জীবনের একটি পর্যায়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্টের নেতৃত্বাধীন পুলিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে ওড়িশার বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীর উপকণ্ঠে জার্মান মাউজার পিস্তল হাতে এক সম্মুখ যুদ্ধে লিপ্ত হন বিপ্লবী বাঘা যতীন-সহ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, বিপ্লবী জ্যোতিষচন্দ্র পাল, বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও বিপ্লবী নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। ভারতের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ব্রিটিশ বিরোধী সেই আগ্নেয় প্রতিরোধ 'বুড়িবালামের যুদ্ধ' হিসেবে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে। বরেণ্য বিপ্লবীদের আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণের মাধ্যমে এদিনের অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বিবাদী বাগে বিপ্লবী স্মরণ

ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল বিপ্লবী সংগঠন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের। এই সংগঠনের তিন জন বিপ্লবী— বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ১৯৩০ সালের ৮ ডিসেম্বর ঝটিকা আক্রমণ হানেন পূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ভরকেন্দ্র রাইটার্স বিল্ডিংসে এবং ইন্সপেক্টর জেনারেল (প্রিজন) এনএস সিম্পসনকে হত্যা করেন। বিনয় ও বাদল আত্মহননের পথ বেছে নিলেও বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তর ফাঁসি হয়। গত ৮ ডিসেম্বর কলকাতায় বিবাদী বাগে এই বিপ্লবী ত্রয়ীর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন এবং তাঁদের আত্মবলিদান স্মরণ করে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স, বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট, বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতি, চট্টগ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের পক্ষ থেকে অনিমিত্র চক্রবর্তী, দোলন ঘোষ, অনিন্দিতা দে, সোমনাথ বসু, মৈনাক চক্রবর্তী, স্বর্ণাভ মুখোপাধ্যায়, অত্রিজ ঘোষ, জাতীয়তাবাদী সংবাদ সাপ্তাহিক স্বস্তিকা-র সম্পাদকীয় বিভাগের সদস্য অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় এবং বিপ্লবী বসন্ত বিশ্বাস স্মারক সমিতির সম্পাদক তরুণ বিশ্বাস-সহ বহু বিশিষ্টজন।

শ্রদ্ধার ১৬৮তম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান

বীরভূম জেলার প্রখ্যাত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা শ্রদ্ধা তাদের ১৬৮ তম শ্রদ্ধাজ্ঞাপন অনুষ্ঠানে গত ডিসেম্বর জেলার আমোদপুর সংলগ্ন ইকড়া গ্রামের ৮৪ বছর বয়স্কা গীতারানি চট্টোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তিনবার ওঙ্কার ধ্বনি ও শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন শ্রদ্ধার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক লক্ষ্মণ বিষ্ণু। প্রদীপ প্রজ্বলন করেন সংস্থার সহ সভাপতি আগমানন্দ মুখোপাধ্যায়। পূজা করেন তাঁর বৌমা বিমলা চট্টোপাধ্যা। মাল্যভূষিত করেন কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়। অর্ঘ্য হিসেবে উত্তরীয়, বস্ত্র, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ফল ও মিষ্টান্ন নিবেদন করেন সংস্থার সভাপতি মহাদেব মুখোপাধ্যায় এবং অনুভবী সুজাতা বিষ্ণু, সনাতন গড়াই, শচীদানন্দ দত্ত। মানপত্র পাঠ করেন অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ও অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রদ্ধার বিষয়ে আলোকপাত করেন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। আরতির পরে স্বীয় মাতৃদেবীর বিষয়ে বলেন পুত্র সঞ্জীব চট্টেপাধ্যায়। শ্রদ্ধার ভূয়সী প্রশংসা করেন উত্তম চট্টোপাধ্যায়। সংগীত পরিবেশন করে অসীমা মুখোপাধ্যায়। নৃ ত্য পরিবেশন করেন গঙ্গোত্রী, অর্পিতা, তিতাস, হৈমন্তী ও সৃজা চট্টেপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা জানান সংস্থার কোষাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ দে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক ও সাংবাদিক পতিত পাবন বৈরাগ্য।

গত ৩০ নভেম্বর ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গুজরাট প্রদেশের কলোল শাখা থেকে প্রতি বছরের মতো এবারও আমেদাবাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের অধ্যক্ষ স্বামী গণেশানন্দজী মহারাজের মাধ্যমে দরিদ্র নারায়ণের মধ্যে কম্বল বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী বৈদ্যনাথানন্দজী, স্বামী বিষ্ণুপদানন্দজী মহারাজ, অশোক ভাই সিংহ, দীনেশ ভাই পটেল, হেমন ভাই, হিমাংশু তিলানী সহ অন্যান্যরা।

নিম্বার্ক দর্শনে অহিংসা এবং ধর্মরক্ষার অনুসন্ধান

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

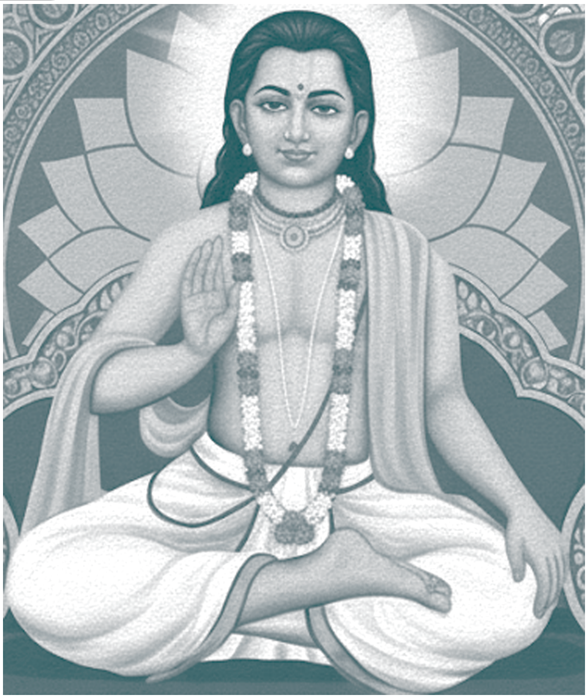

শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য

ধর্ম আর রিলিজিয়ন এক নয়। ধর্মের অর্থ যখন 'ধরে রাখা', প্রকৃত ধর্ম কখনোই ধরে রাখার ক্ষেত্রে 'ভয়জ' হতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম হবে 'প্রেমজ'; হবে দর্শন ও কর্মের সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ। থাকতে হবে মাধুর্যপ্রধান ভক্তি, থাকবে প্রীতি ও সখ্যজনিত ভক্তি; যাতে শতভক্তের প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করে। তরবারি দেখিয়ে, তরবারির শাসনে কখনো প্রেমজ ধর্ম গ্রহণ হতে পারে না।

বলা যায়, ব্রহ্ম সম্পর্কে সমস্ত তত্ত্বই শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। যেমন শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের একান্তাদ্বৈত তত্ত্ব, শ্রীবিষ্ণুস্বামী আচার্য্যের বিশুদ্ধাদ্বৈত তত্ত্ব, শ্রীরামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টা-দ্বৈততত্ত্ব, শ্রীমধ্বাচার্য্যের দ্বৈততত্ত্ব প্রভৃতি। কিন্তু সমস্ত তত্ত্বের সমন্বয় করা যায় ভেদাভেদ তত্ত্ব স্থাপিত শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের দর্শনে।

এদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে বেদান্ত সম্প্রদায়ে শ্রীনিম্বার্কের স্থান অতি উচ্চ। এই দর্শন হৃদয়কে স্পর্শ করে, সঞ্জীবিত করে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের ভেদাভেদ তত্ত্ব ব্রহ্মসূত্রকার সম্মত, পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ জীব, জগৎ, ঈশ্বর ও অক্ষর— এই পূর্ণ চতুষ্পাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। জীব, জগৎ, মায়া— সবই ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ। সবই ব্রহ্মস্বরূপের অংশ, ব্রহ্মের মতোই সত্য। জীবগৎ গুণত ও কার্যত ব্রহ্ম হতে ভিন্ন, কিন্তু স্বরূপত ব্রহ্ম হতে অভিন্ন। জীব বিষয়ে শ্রীরামানুজাচার্য্যের সঙ্গে নিম্বার্কাচার্য্যের মতের পার্থক্যও বিশেষ নেই। রামানুজের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মের গুণ বা বিশেষণীভূত অংশ। নিম্বার্কের মতে, জীবজগৎ ব্রহ্মের শক্তিরূপ স্বাভাবিক অভিন্ন অংশ।

নিম্বার্কবেদান্তে জীবজগৎকে সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে; 'মায়া' বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়নি। জীবের জীবত্ব মিথ্যা ও অজ্ঞান-কল্পিত বলা হয়নি। জীবনে আশার বাণীই শোনানো হয়েছে। জীব সত্য, চিরকালের সত্য। মুক্তিতেও জীবের অস্তিত্ব। মুক্তাবস্থাতেও জীব ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করতে পারে। শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যের মতে, অধিকারীভেদে একই ব্রহ্ম সম্বন্ধে এই তত্ত্বগুলির মধ্যে যে কোনো একটি তত্ত্ব অবলম্বন করে ঈশ্বরের উপাসনা করলেও বিরোধ কিছুমাত্র নেই। সেদিক থেকে দেখতে গেলে ভারতীয় দর্শনে 'হিংসা'-র স্থান নেই।

শ্রীবৃন্দাবন থেকে শ্রীধনঞ্জয়দাসজী ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ সালে জনৈক শিষ্যকে চিঠিতে লিখছেন, 'ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের 'কথামৃত' দুই খণ্ড পাঠ করিয়া আনন্দ পাইয়াছ, ইহা ভালোই। এইরূপ পুস্তক পাঠ করিলে উপকারই হয়, তাহাতে দোষের কোনো শঙ্কা করিবার কারণ নাই।' আরেকটি চিঠিতে পাওয়া যায় (২৩.৭.১৯৪০), 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, একথা মনে করিবার কোনো কারণ নাই। তোমরা যে পথে আসিয়াছ তাহাতে তিনি তোমাদের প্রতি বরং প্রসন্নই থাকিবেন।' অর্থাৎ কোনো বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবকাশ এখানে দেখা যাচ্ছে না।

'অহিংসা মানে হিংসাশূন্যতা। হিংসা বিষয়ে আলোচনায় দুটি দিক আসতে পারে। ১. খাদ্যের জন্য জীবহত্যা বা হিংসা, আমিষ ভক্ষণ। ২. ধর্মরক্ষার্থে জীবহত্যা অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধ। মহাভারতে পাওয়া যায়, 'অহিংসা পরমো ধর্ম, ধর্ম হিংসা তথৈব চ।' অহিংসা হলো মানুষের পরম ধর্ম এবং ধর্মরক্ষার জন্য হিংসা করা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ধর্ম। ধর্মরক্ষার জন্যই কুরুক্ষেত্রের রণক্ষেত্রে মহাভারতের যুদ্ধ হয়েছিল। মহাকাব্যিক প্রবাদে তাই বলা হয়েছে, 'ধর্ম এব হতো হন্তি/ধর্মো রক্ষতি রক্ষিত।' যে ধর্মকে রক্ষা করে, ধর্ম তাকে রক্ষা করে।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার পূর্বাপরে হিন্দুদের উপর নেমে

এসেছিল বিধর্মীদের নারকীয় তাণ্ডব, হত্যাকাণ্ড, নারীধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, বাস্তুচ্যুতির লক্ষ লক্ষ ঘটনা। ১৯৪৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর শ্রীবৃন্দাবন থেকে শ্রীধনঞ্জয়দাসজী একটি চিঠিতে তাঁর এক শিষ্যাকে লিখছেন, 'ইহা নিজেদেরই কর্মের ফল, ইহা নিশ্চিত জানিবে। ধর্ম হিন্দুদের মধ্যে এক প্রকার নাই বলিলেই হয়। ধর্ম থাকিলে ধর্ম নিশ্চয়ই তাহাদিগকে রক্ষা করিতেন। 'ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ', এই কথা মিথ্যা নয়। ধর্ম থাকিলে হিন্দুদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষার জন্য স্বতঃই একতাবদ্ধ হইত। এখনো হিন্দুরা ধর্মকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারিলে ভালো। ভগবদিচ্ছা যাহা তাহাই হইবে।'

১৯৪৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আর একটি চিঠিতে তিনি লিখছেন, 'অর্জুন বিপন্ন হওয়াতেই শ্রীভগবান গীতার জ্ঞান দিয়া তাঁহার মোহ দূর করেন।' অর্থাৎ দেখতে পাওয়া যায়, বিপন্ন হলে সশস্ত্র হওয়ার বার্তা ভগবান স্বয়ং দিচ্ছেন। শ্রীধনঞ্জয়দাসজী আরও লিখছেন, 'মনুষ্য দেহধারী জীবের দুঃখ বিপদ আসিবে না এমন হইতে পারে না, কিন্তু বিপদ আসিলেও যিনি বিচলিত হন না, অবিচলিত থাকিয়া কর্তব্য পালন করিয়া যাইতে পারেন, তিনিই স্থায়ী শান্তি লাভ করিতে পারেন। ...দুঃখ বিপদ মানুষকে গড়িয়া তোলে। তাহাতে মানুষের কল্যাণ হয়। দুঃখ বিপদ না আসিলে মানুষ সর্বদাই অহঙ্কারে মত্ত থাকিত।' আলাদাভাবে কথাগুলি লেখা হলেও যদি এক একটি ফুলের মতো তা দিয়ে মালা গাঁথা যায়, তাহলে এক দৃঢ় সন্তবাণী মানুষের মধ্যে প্রবেশ করবে।

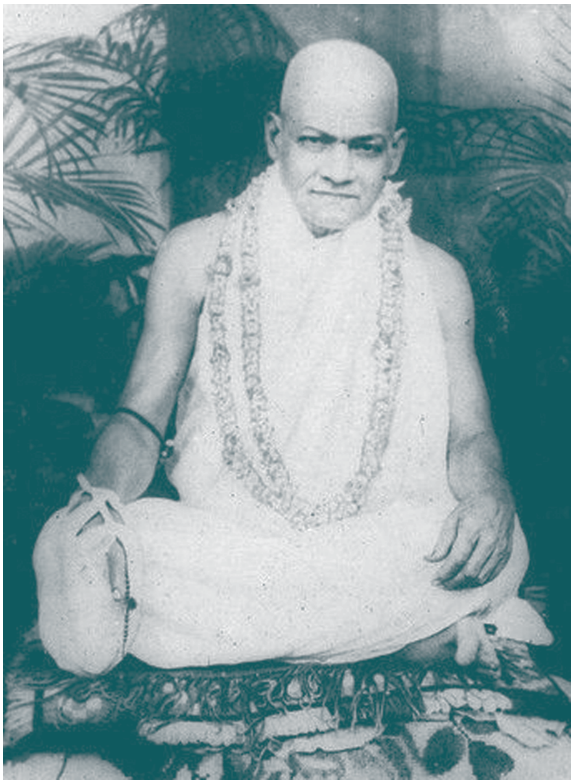

শ্রীরামদাসজী

গীতাগ্রন্থে দেখা যায়, দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে, ভগবান বলছেন, 'ক্লৈবং মা স্ম গমঃ পার্থ'। হে পৃথা-পুত্র (পার্থ), ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হয়ে না। এ তোমার উপযুক্ত নয়। কাঠিয়া বাবাজীর জীবনীতে পাওয়া যায়, 'শ্রীমদভগবদ্গীতা আমার এতই প্রিয় ছিল যে, ওই গীতাগ্রন্থ আমার বক্ষের উপর রাখিয়া তাহা বস্ত্র দ্বারা শরীরের সহিত বন্ধন করিয়া গুরু-গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পিতৃভবনে উপস্থিত হইলাম।'

রামদাসবাবাজীর গুরুদেব তথা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের ৫৩তম আচার্য শ্রীদেবদাসজী হিন্দুধর্ম যাজনের বিষয়ে হিন্দুদের উপর বিধর্মীদের কোনো অন্যায় নির্দেশ মেনে নিতেন না। ১৯ শতকের তৃতীয়/চতুর্থ দশকে ভূপাল-তালের কাছে বসতকারী এক মুসলমান নবাবের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। হিন্দুদের জন্য নবাবের ঘোষণা ছিল, কেউ শঙ্খধ্বনি বা ঘণ্টাধ্বনি করতে পারবে না। দেবদাসজী নিজেই সজোরে শঙ্খধ্বনি করে নবাবের আদেশে শিরশ্ছেদের শাস্তি পান। কিন্তু যোগবলে, অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন করে তিনি নবাবকেই ভীত করে তোলেন। নবাব ক্ষমাপ্রার্থনা করে আদেশ প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। দেবদাসজীর সোজা বক্তব্য, 'তুমি মুসলমান, তোমার ধর্ম তুমি পালন কর; কিন্তু হিন্দু হিন্দুর ধর্মযাজন করবে, তাতে তুমি কেন বিঘ্ন উৎপাদন করবে?' সেই ভূপাল-তালেই মন্দির সংস্কার করে দেবদাসজী বৈষ্ণব সমাজের এক পবিত্র তীর্থস্থান বানিয়ে তুলেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃততেই পাওয়া যায়, ভেদবুদ্ধি আর নারায়ণবুদ্ধি দুটো একই সঙ্গে থাকতে হবে। সব নারায়ণ হলেও সকলের সঙ্গে এক রকম ব্যবহার করা চলে না। মাহুত নারায়ণ একটি লোককে বলেছিল, 'সরে যাও সরে যাও।' লোকটি সরে গেল না, কারণ সে ভাবল— হাতিও নারায়ণ। সর্বত্র নারায়ণ দর্শন করলে সকলের সঙ্গে একই রকম ব্যবহার হবে— এমন কথা নয়।

মৎস্যাহার নিয়ে একসময় বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাঙ্গালিকে ঘৃণার চোখে দেখা হতো। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণেরা পর্যন্ত মাছ খায়। এটি অত্যন্ত কদাচার। তার পরেও কিন্তু উপায়হীন দরিদ্র বঙ্গবাসীকে আধ্যাত্মিক আশ্রয় দিয়েছেন শ্রীরামদাসজী। সন্তদাসজীর লেখায় তা পাওয়া যায়। বৃন্দাবন আশ্রমে কয়েকজন ব্রজবাসী রামদাস বাবাজীকে বলছেন বাঙ্গালি কদাচারী। সন্তদাসজী পাশেই ছিলেন, ব্রজবাসীর এমন বহু আচার আছে, যা বাঙ্গালির চোখে ঘৃণ্য। যেমন পশুর চামড়ায় তৈরি মশকবাহিত জলপান, প্রস্রাব করে ব্রাহ্মণের জলশৌচ না করা, পথিকের একস্থানে বাহ্যে গিয়ে আর এক স্থানে জলশৌচ করা, পরিধানের কাপড় পূতিগন্ধময় হলেও পরিবর্তন না করা প্রভৃতি কদাচার। ব্রজবাসীর উত্তর, আচরণগুলি কদাচার হলেও তাতে আর যাইহোক

জীবহত্যা হয় না। কিন্তু মৎস্য ভক্ষণে বহু পাপের জন্ম হয়। এর উত্তরে সন্তদাসজী বললেন, ভগবান জীবকে জীবের আহারের জন্য সর্বত্র বিধান দিয়েছেন। মৎস্যাহার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ নয়, মনুসংহিতাতে আছে। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবহারের বিরুদ্ধে জীবহিংসা পাপ। আমরা যে উদ্ভিজ খাবার খাই, উদ্ভিদও জীব— আহার-বিহার, শ্বাসপ্রশ্বাস, নিদ্রা সবই আছে। ফলমূল, বীজ সর্বই প্রাণময়। জলপানে এবং শ্বাসপ্রশ্বাসে বহু জলীয় ও বায়বীয় আণুবীক্ষণিক জীবের বিনাশ ঘটে। তাই সম্যকভাবে জীবহিংসা পরিত্যাগ করা অসাধ্য। এরপর ব্রজবাসীটি কথায় নিরস্ত্র হলেন।

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে শ্রীরামদাসজী উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যাওয়া এক মেধাবী বাঙ্গালি ব্রাহ্মণকুমারের গল্প বলেছিলেন। শিষ্যটি সর্বশাস্ত্র বিশারদ হয়ে বঙ্গদেশে গৃহস্থাশ্রম গ্রহণ করেছেন। প্রিয় শিষ্যকে দেখতে তিনি একবার বঙ্গে এলেন। দেখলেন গৃহে মৎস্যাহারের প্রচলন এবং শ্রীসূর্যনারায়ণকেও সেই ভোগ অর্পণ করা হয়েছে। গুরুদেব শিষ্যকে কদাচারী বলে ভর্ৎসনা করলেন। শিষ্য গুরুদেবকে পাশে বসিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে সূর্যনারায়ণকে আহ্বান করে দেখালেন, দেবতা নানান মাছের ব্যঞ্জন অঙ্গীকার করছেন। গুরুদেবের চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হলো। তিনি নিজের ভুল স্বীকার করলেন। কিন্তু নিজের দেশে গিয়ে সকলের সামনে সূর্যদেবতাকে মৎস্যভোগ অর্পণ করে তা গ্রহণ করাতে পারলেন না। অনশনে বসলেন তিনি এবং

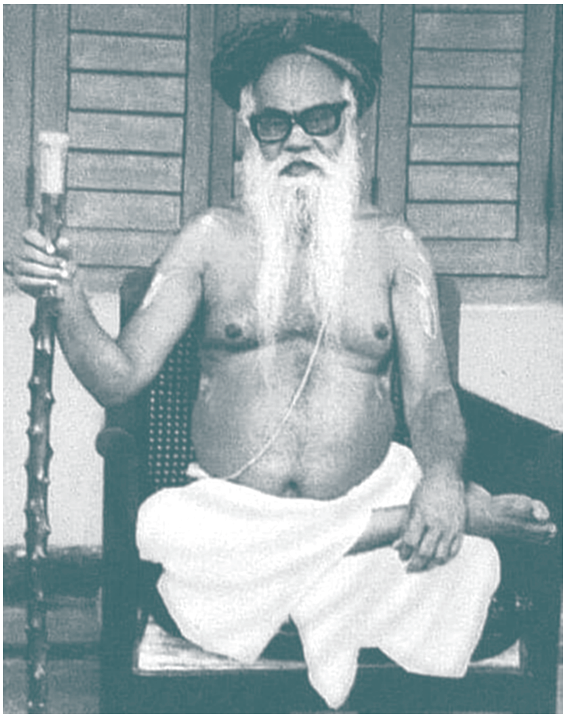

শ্রীধনঞ্জয়দাসজী

ধ্যানে জানতে পারলেন, সেই ভোগ অপবিত্র ছিল, তাই গ্রহণ করেননি তিনি। যেখানে মৎস্যাহারের প্রচলন নেই, অন্য নিরামিষ ভোজদ্রব্যের প্রচলন থাকতে কেন তিনি মাছের ব্যঞ্জন গ্রহণ করবেন? কাহিনির অবতারণা করে শ্রীরামদাসজী বলছেন, সহজলভ্যতা, খাদ্যগ্রহণের বাধ্যবাধকতা-সহ নানান অবস্থা বিবেচনা করে কোনো প্রদেশের খাদ্যাভ্যাস প্রচলিত হয়। তাই তিনি বলছেন, মৎস্যগ্রহণের ব্যাপারে দেশাচার অনুসরণে তাঁর আপত্তি নেই, কিন্তু মাংস ব্যবহার না করাই ভালো। বলছেন, বৈষ্ণবদের পক্ষে মৎস্য-মাংস ব্যবহার না করাই প্রশংসনীয়। তীর্থস্থান যেমনই হোক, মাছের ব্যবহার সঙ্গত নয়।

১৯৪০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি শ্রীধনঞ্জয়দাসজী খুলনা থেকে এক ভক্তের উদ্দেশ্যে চিঠিতে পরিষ্কার করে নির্দেশ দিচ্ছেন, 'হরি ও হর একই ভগবানের ভিন্নরূপ— ইহাই সত্য। বৈষ্ণবের দেবীপূজা দর্শনে বা প্রসাদ গ্রহণে দোষ নাই। তবে মাংসাদি বা তৎসংশ্লিষ্ট প্রসাদ বৈষ্ণব গ্রহণ করিবেন না।' ১৯৫৮ সালের ১ ফেব্রুয়ারিতে বৃন্দাবন থেকে শ্রীধনঞ্জয়দাসজী আর একটি চিঠিতে লিখলেন, 'সপ্তাহে একদিন নিরামিষ আহার করিলে ভালোই। আমিষবস্তু ভোগ দিবে না।'

সার্বিক আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, জীবহিংসা বা জীবহত্যার কথা নিম্বার্ক দর্শনে কোথাও বলা হচ্ছে না। কিন্তু দেশাচারের গণ্ডির মধ্যে পরিস্থিতির বাধ্যবাধকতায় কেউ যদি প্রাণীজ খাদ্য গ্রহণ করেই থাকেন, তাঁকে কদাচারী আখ্যা দিয়ে তাঁকে ঈশ্বর-বিমুখ করিয়ে রাখাও চলে না। কৃপা তিনিও পেতে পারেন। এই জগতে খাদ্য-খাদকের সম্পর্কে গড়ে উঠেছে হাজার হাজার ফুড চেইন এবং ফুড ওয়েভ। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে দেখা যায় দেবী শাকম্ভরী নিজ দেহগাত্র থেকে উদ্ভূত নানান শাকসবজি দিয়ে অজন্মা ও অকালের সময় ক্ষুধিত মর্ত্যবাসীকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের মতো শ্রীভগবানের উদরস্থ থেকে তাঁর উদরস্থ খাদ্যের রস দ্বারা জীব পরিপুষ্ট হচ্ছে। জীবের সঙ্গে ব্রহ্মের অচ্ছেদ্য ও নিবিড় প্রেমের সম্পর্ক সত্ত্বেও তাঁরই নির্মিত খাদ্যভাণ্ডারে, মালঞ্চে মহাজীবন দ্বারাই সে জীবিত থাকে। কিন্তু কোনো বর্জিত দেশে জীবহিংসায় প্রস্তুত খাদ্য অপবিত্র ভোগ বলে চিহ্নিত হয়। তা গ্রহণ করা চলে না। দ্বিতীয়ত, ধর্মরক্ষার জন্য আমাদের শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অনুসৃত অর্জুনের ভূমিকায় অবতীর্ণ না হলে চলে না। হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতেই হবে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

তথ্যপঞ্জি :

১. স্বামী ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা, শ্রীনিম্বার্কাচার্য্য, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ ও সাধন প্রণালী, তৃতীয় ভাগ, ১৯৭০, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর। ২. অমরনাথ ভট্টাচার্য, শ্রীনিম্বার্ক ও দ্বৈতাদ্বৈতদর্শন, ১৯৬৬, প্রকাশক : ডাক্তার কৃষ্ণলাল দাম, খড়্গপুর। ৩. শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা, শ্রীশ্রী ধনঞ্জয় দাস পত্রামৃত, ১৯৯৭ (দ্বিতীয় সংস্করণ), কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর।

৪. শ্রীধনঞ্জয়দাস কাঠিয়া বাবা, লিপিকা, ১৯৯৮, কাঠিয়া বাবার আশ্রম, সুখচর।

সংবাদপত্রে মুক্ত ভাষার কাণ্ডারি স্বামীনাথন সদানন্দ

কৌশিক রায়

প্রখ্যাত ব্রিটিশ মনীষী ও বাগ্মী—এডমন্ড বার্ক সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ বা 'The Fourth Estate' বলেছিলেন। অনেক দেশেই স্বৈরাচারী শাসকদের একনায়কতন্ত্র সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করতে চেয়েছে। ১৮৭৬ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় লিটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট চালু করে দেশীয় ভাষাতে প্রকাশিত ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিলেন। এই কালাকানুনের প্রতিবাদে শিশির কুমার ঘোষ এক রাতের মধ্যে অমৃতবাজার পত্রিকাকে ইংরেজি ভাষাতে রূপান্তরিত করে প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে শিশির কুমার, 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, 'দ্য হিন্দু' পত্রিকার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য আইয়ার এবং দ্য হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মতোই 'ফ্রি প্রেস' গোষ্ঠীর সংবাদপত্রের জাতীয়তাবাদী সম্পাদক স্বামীনাথ সদানন্দ প্রতিবাদ করেছিলেন। ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর ঔপনিবেশিক দমননীতির সামনে নতি স্বীকার করেননি তিনি।

প্রথামূলক শিক্ষালাভ করেননি স্বামীনাথ সদানন্দ। তবুও, সব বিষয়ের ওপরই তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁর স্নেহময় ও সতর্কমূলক তত্ত্বাবধানে 'ফ্রি প্রেস' গ্রুপে সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষালাভ করেন লেখক রসীপুরম কৃষ্ণস্বামী নারায়ণ আয়েঙ্গারের কৃতবিদ্য অগ্রজ কার্টুনিস্ট আর.কে লক্ষ্মণ, 'এশিয়াউইক' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক টি.জে.এস জর্জ, ক্রীড়াধারাভাষ্যকার এ.এফ.এস. তালিয়ার খান প্রমুখ। সংবাদ জগতে রুপার্ট মারডোক আর পল জুলিয়াস রয়টারের সঙ্গে স্বামীনাথ সদানন্দের তুলনা করা চলে। রাজা হাথিসিং, টাটা সংস্থার পূর্বতন ডিরেক্টর শারোখ সাহাভালা, সিকিমের রাজ্যপাল এবং লিবিয়া ও ইতালিতে ভারতের রাষ্ট্রদূত হোমি তালিকার খানও ফ্রি প্রেস-এ সদানন্দের কাছে সাংবাদিকতার তালিম নেন। ১৯০০ সালে মাদ্রাজে জন্ম নেন স্বামীনাথ সদানন্দ। সৎ-মায়ের অত্যাচারে বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই গৃহত্যাগী হন তিনি।

সদানন্দের বাবা আবার একটি তামিল সংবাদপত্র সম্পাদনা করতেন। তাই, বাল্যকাল থেকেই সদানন্দ সাংবাদিক হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতেন। বোম্বের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের হয়ে কিছুদিন কাজ করেছেন সদানন্দ। প্রয়াগরাজ থেকে প্রকাশিত 'দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট' সংবাদপত্র এবং 'রেঙ্গুন টাইমস্'-এরও সাংবাদিক ছিলেন। ১৯২৩ সালে বোম্বেতে তিনি কংগ্রেস দলের প্রকাশিত ইস্তাহারের

সম্পাদনার কাজ এবং খাদি কাপড়কে জনপ্রিয় করে তোলার কাজ পান। তবে, সদানন্দের মন চেয়েছিল পূর্ণ সময়ের জন্য সাংবাদিকতা করতে। সেই সময়ে ভারতে সংবাদ সংস্থা বলতে রয়টার আর অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস। তাদের হয়ে কাজ করতে হলে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের খবরের বদলে ব্রিটিশদের স্বার্থপুষ্ট খবরই করতে হতো। সদানন্দ ঠিক করলেন— একটি জাতীয়তাবাদী, ভারতহিতৈষী সংবাদ সংস্থা খুলবেন— যেখানে এদেশের নিপীড়িত মানুষের আশা-নিরাশার কথা বলা হবে। এই কাজে সদানন্দকে আর্থিক সাহায্য দিতে এগিয়ে এলেন কয়েকজন শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী।

১৯২৭ সালে 'ফ্রি প্রেস এজেন্সি' সংবাদসংস্থার স্থাপনা করলেন স্বামীনাথ সদানন্দ। প্রথমে এই সংবাদসংস্থায় মাত্র দুইজন কর্মী ছিলেন— সদানন্দ স্বয়ং এবং তাঁর বাল্যবন্ধু কে শ্রীনিবাসন। সংবাদসংস্থাটি থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রের কয়েকজন গ্রাহক করা হলো। তবে, ১৯৩০ সালে গান্ধীজীর লবণ আইন অমান্য আন্দোলনকে দমন করার পাশাপাশি দেশপ্রেমিক ফ্রি প্রেস এজেন্সির ওপরও কড়া বিধিনিষেধ আরোপ করলো ব্রিটিশ সরকার। ফ্রি প্রেসে পাঠানো সমস্ত টেলিগ্রামকে ব্রিটিশ সরকার সেন্সর করতো। সদানন্দকে চাপ দেওয়া হতো এই সংবাদসংস্থার অফিসে তালা ঝুলিয়ে দিতে। হার মানলেন না সদানন্দ। একক প্রচেষ্টাতে প্রকাশ করলেন ফ্রি প্রেস বুলেটিন নামে সাইক্লোস্টাইল করা একটি দুই পাতার ট্যাবলয়েড সংবাদপত্র। একটি সস্তা মুদ্রণযন্ত্রও কিনে নিলেন তিনি। ১৯৩০ সালের ১৩ জুন ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশবিরোধী ও জাতীয়তাবাদী খবরাখবর ছেপে গেল এই সংবাদপত্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের খবর নিজে খুব বড়ো করে লিখতেন সদানন্দ।

১৯৪৬ সালে দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্রিটেন থেকে পেথিক লরেন্স আর স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর নেতৃত্বে আসা ক্যাবিনেট মিশনের বিরুদ্ধে সরাসরি প্রতিবাদ করেছিলেন সদানন্দ। ক্যাবিনেট মিশনের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না— সেটাও বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। সত্যনিষ্ঠ, নিখুঁত, তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনে বিশ্বাস করতেন স্বামীনাথ সদানন্দ। পক্ষপাতদুষ্ট, কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা রিপোটারকে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর ফ্রি প্রেস সংবাদপত্র যেন স্বাধীনতা এবং দেশপ্রেমিকতার বিমূর্ত রূপ হয়ে উঠেছিল। ইংরেজরা সদানন্দকে দুইবার রাজদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবাস করায়। সেই যুগে ৭০ হাজার টাকা জরিমানা হয় তাঁর।

মহাত্মা গান্ধীকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ১৯৪৪ সালে সমালোচনা করেন সদানন্দ। মুসলিম লিগের প্রধান মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর সমঝোতাকেও বিরোধিতা করেন তিনি।

ওল্ডসমোবাইল মোটরগাড়িতে করে, জোব্বা আর ধুতি পরে প্রতিদিন সকাল ১০টাতে ২১, দালাল স্ট্রিট ফ্রি প্রেস জার্নালের অফিসে এসে নামতেন স্বামীনাথ সদানন্দ। তাঁর পায়ে ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ ছিল। পায়ের অসহ্য ব্যথা নিয়েও তিনি কাজ করে যেতেন নিরলসভাবে। অনেক সময় সদানন্দকে কর্মীরা তিনতলাতে নিয়ে গিয়ে চেয়ারে বসিয়ে দিত। দেব-দেবীদের ছবিতে মালা দিয়ে এবং পূজা করে দিনের কাজ শুরু করতেন তিনি। তাঁর অফিসের দেওয়ালে বিভিন্ন দেব-দেবীর ছবি টাঙানো থাকতো। ভুল তথ্য লেখা, পক্ষপাতদুষ্ট সাংবাদিককে বরখাস্ত করতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করতেন না। সদানন্দের ব্যক্তিগত সচিব, মাত্র ১৯ বছর বয়সে হয়েছিল মি. ভাণ্ডারেকর। তাঁর অনেক ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন সদানন্দ। তাঁর কাছে ইংরেজির শিক্ষালাভের পর বোম্বে হাই কোর্টে ভালো কাজ পেয়েছিলেন ভাণ্ডারকর। 'বোম্বে সেন্টিনেল' সংবাদপত্রের সম্পাদক বি.জি. হর্নিম্যান সদানন্দকে দালাল স্ট্রিটের নাচিয়ে দরবেশ বলে ব্যঙ্গ করলেও সদানন্দ, হর্নিম্যানকে মোটা টাকা সাম্মানিক দিয়ে তাঁর আত্মজীবনী ফ্রি প্রেস জার্নালে নিয়মিত ছাপতেন।। গুরুগম্ভীর শব্দ দিয়ে রিপোর্টিং করাটা সদানন্দের পছন্দ ছিল না। তিনি মহাত্মা গান্ধীরও কঠোর সমালোচনা করতেন।

১৯৪৭ সালে দেশভাগের সমর্থনকারী জুনাগড়ের মুসলমান শাসকের বাড়ি ভারতীয় নৌসেনা অবরোধ করলে স্বামীনাথ সদানন্দ সেই জাহাজগুলি এবং নৌবাহিনীর ইউনিটগুলির নাম খবরের কাগজে প্রকাশ করে দেন। এর ফলে তাঁর ওপর প্রচণ্ড রেগে যান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল যিনি সেই সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বন্ধ করার জন্য ১৯৪৪ সালে সমালোচনা করেন সদানন্দ। মুসলিম লিগের প্রধান মহম্মদ আলি জিন্নার সঙ্গে গান্ধীজীর সমঝোতাকেও বিরোধিতা করেন তিনি। সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে বিরুদ্ধতা থাকার জন্য লন্ডন আর ওয়াশিংটনে আন্তর্জাতিক প্রেস ব্যুরো স্থাপনের অনুমতি পাননি সদানন্দ। ১৯৫১ সালে ভারত সরকার সংবাদপত্রের স্বাধীনতাবিরোধী আইন চালু করলে তার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন স্বামীনাথ সদানন্দ। তিনি ফ্রি প্রেস জার্নালে দৃপ্ত লেখনীতে লেখেন— 'Freedom of Expression is our birthright and we shall not rest until it is fully guaranteed by the Constitution.' সদানন্দই প্রথমে বুঝতে পারেন— খেলাধুলার সংবাদ জনপ্রিয় হবেই। ডায়াবেটিস ও উচ্চ রক্তচাপ কেড়ে নেয় এই সংবাদ-দধীচির অমূল্য জীবন। ◻

বিজয় দিবস

১৯৭১ সালে ভারতের বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

কর্নেল (ড.) কুণাল ভট্টাচার্য

প্রতি বছর ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৭১ সালের যুদ্ধে ভারতের নির্ণায়ক সামরিক জয়ের স্মরণে। এই বিজয়ের ফলেই পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সংঘর্ষের প্রধান ঘটনা

● **সূচনা :** যুদ্ধের সূত্রপাত হয় পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক ও মানবিক সংকটের কারণে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী পূর্ববঙ্গে বাঙ্গালি নাগরিকদের ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালায়। এর ফলে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়।

● **ভারতের হস্তক্ষেপ :** ভারত স্থানীয় প্রতিরোধ গোষ্ঠী মুক্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ, অস্ত্র ও সহায়তা প্রদান করে।

● **যুদ্ধের সূচনা :** ৩ ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তান ভারতীয় বিমানঘাঁটিগুলোর ওপর অতর্কিত বিমান হামলা চালায়। এর পরপরই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থনে সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেয়।

● **দ্রুত অভিযান :** যুদ্ধ মাত্র ১৩ দিন স্থায়ী হয়। এই সময় ভারতীয় সেনা, নৌ ও বায়ুসেনা পূর্ব ও পশ্চিম দুই ফ্রন্টে অত্যন্ত দ্রুত ও সমন্বিত অভিযান পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের এই যুদ্ধে পূর্ববঙ্গের মুক্তির জন্য ভারতের কয়েক হাজার সৈনিক প্রাণ বিসর্জন দেন— অফিসিয়াল তথ্যানুযায়ী প্রায় ৩৮৪৩ জন নিহত এবং ৯০০০-এর বেশি আহত হন। কিছু সূত্রে নিহতের সংখ্যা ১২০০০ পর্যন্ত বলা হয়। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই নির্ণায়ক বিজয়ের জন্য এ ছিল অসামান্য ত্যাগের নিদর্শন।

● ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ অভিযানে ইস্ট ফ্রন্ট দ্রুত অগ্রগতি লাভ করে এবং পাকিস্তানি বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে।

● **আত্মসমর্পণ (১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১) :** ঢাকায় পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজি আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমেই যুদ্ধের ইতি ঘটে এবং ভারত ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে এবং স্বাধীন বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

বিজয়ের গুরুত্ব

● **দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সর্ববৃহৎ আত্মসমর্পণ :** প্রায় ৯৩ হাজার পাকিস্তানি সেনা ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে— যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সবচেয়ে বড়ো সামরিক আত্মসমর্পণ হিসেবে বিবেচিত।

● **বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ :** পাকিস্তানের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ শেষ হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটে।

● **আঞ্চলিক শক্তির উত্থান :** এই বিজয় ভারতীয় সামরিক কৌশল, দক্ষতা এবং দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের প্রভাবশালী অবস্থানকে সুদৃঢ় করে।

● **হুতাত্মাদের স্মরণ :** বিজয় দিবস সারা দেশে উদ্‌যাপিত হয় দেশের সুরক্ষায়, ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন সেই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের সাহস, বীরত্ব ও ত্যাগকে শ্রদ্ধা জানাতে।

উপসংহার :

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি সামরিক সংঘর্ষ ছিল না, ছিল সম্মান, গণতন্ত্র ও সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষার সংগ্রাম। এই যুদ্ধ রাজনৈতিক বঞ্চনা ও জাতিগত দমন-পীড়নের বিপদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের মিত্রদের বিজয় প্রমাণ করে যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ঐক্যবদ্ধ মানুষকে দমিয়ে রাখা যায় না।

এই যুদ্ধ বাংলাদেশের জাতীয় পরিচয়ের মূল ভিত্তিগুলোর একটি এবং স্বাধীনতার জন্য করা ত্যাগের স্মারক। এটি ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক দমন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে লড়াই। ◻

কেমন আছেন পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা?

অমলেশ মিশ্র

পূর্ববঙ্গ বা অধুনা বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের খবর এই প্রতিবেদকের জানা নেই। দেশটি বর্তমানে ইসলামি। ইসলামিদের স্বাধীন চিন্তার সুযোগ থাকে না। তাদের কোরানে বলা হয়েছে যে, যে বিষয়ে আল্লা ফয়সালা করে দিয়েছেন সে বিষয়ে তারা তাই মানবেন বা মানতে বাধ্য। কোরানের বাইরে আর কোনো জ্ঞান থাকতে পারে না।

সুবিখ্যাত আলেকজান্দ্রিয়ার জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থাগার ধ্বংস করার আগে গ্রন্থাগারিককে প্রশ্ন করা হয়, গ্রন্থাগারের পুস্তকগুলিতে কী আছে। উত্তর ছিল— জ্ঞান ভাণ্ডার। যারা গ্রন্থাগার ধ্বংস করেছিল, তাঁদের যুক্তি ছিল যে বইগুলিতে যা আছে কোরানেও সেই জ্ঞান আছে তাই ওই গ্রন্থাগার অনাবশ্যক— পুড়িয়ে দেওয়া যায়। আর যদি কোরানের সঙ্গে মিল না থাকে, তবে পুস্তকগুলি বিপজ্জনক। তাই পুড়িয়ে দেওয়া যায়। ফলে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিশ্রুত গ্রন্থাগারটি ধ্বংস করা হয়। একইভাবে ভারতের নালন্দার গ্রন্থাগার ধ্বংস করা হয়েছে। ১৪০০ বছর আগেকার ধ্যান ধারণা নিয়ে চলতে গেলে— পরিবর্তনকে অস্বীকার করা হয়। অধুনা বাংলাদেশ বা অন্যান্য ইসলামি দেশে 'বুদ্ধিজীবী' নামে কোনো সম্প্রদায় আছে কিনা আমি জানি না, মনে হয় নেই। তাদের সমাজের বিবেক তো কোরান স্থির করে দিয়েছে তাই আলাদা করে বিবেকবান থাকবেন, এতো হয় না।

যদি কোরানের বাইরে কোনো বিবেক থাকে, তবে তাকে ইসলাম ত্যাগ করতে হয়। এই প্রতিবেদক কয়েকজন বিবেকবান (কোরান অসম্পর্কিত) মুসলমানের লেখা বই পড়েছে— যাঁরা ইসলাম বিশ্লেষণ করে মজহব ত্যাগ করেছেন। এছাড়া তাঁদের উপায় ছিল না।

কিন্তু এই বঙ্গে অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বাঘা বাঘা বুদ্ধিজীবীদের দেখা আমরা পেয়েছি। সে সময় বঙ্গদেশ খণ্ডিত হয়নি। ভারতবর্ষে কোনো কালেই বুদ্ধিজীবীর অভাব ছিল না। তবে তাঁরা সংগাঠনিক ভাবে কোনো বুদ্ধিজীবী ক্লাব বা সঙ্ঘ তৈরি করেননি। রাজা, মহারাজারা নানা বিষয়ে, বিশেষ করে, কোনো জটিল বিষয়ে, ওই বুদ্ধিজীবীদের কাছে পরামর্শ করতেন। ফলে 'বুদ্ধিজীবী'দের সম্পর্কে দেশের তাবৎ মানুষের একটি শ্রদ্ধা ছিল। সেই সব বুদ্ধিজীবীরা না ছিলেন বিকৃত, না ছিলেন বিক্রীত। রাজা মহারাজাদের রাজসভায়ও বুদ্ধিজীবীদের সদস্য হিসেবে পাওয়া যেত। দক্ষিণ ভারতে তেনালী রমণ আর বঙ্গে গোপাল ভাঁড়ের নাম আমরা শুনেছি।

এই প্রতিবেদকের সীমিত জ্ঞানের মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত ব্যক্তিত্ব। আমরা জানি যে রাজা রামমোহন সতীদাহ প্রথা বিলোপে ব্যাপক সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি না চাইলেও, সে বিষয়ে ইংরেজ সরকার আইন প্রণয়ন করেছিলেন। রামমোহন চেয়েছিলেন দেশের মানুষরা উদ্যোগ নিয়ে এই ব্যবস্থা বন্ধ করুক। রাজা রামমোহন রায় একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন। তারপরে পাওয়া গেল ঈশ্বরচন্দ্রকে— যিনি বিদ্যাসাগর ও দয়ার সাগর নামে সমাজে পরিচিত ছিলেন। বহু প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে আপন প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। শাস্ত্রজীবী সমাজকে শাস্ত্রবিধির উল্লেখ করেই বিধবা বিবাহকে সরকারি আইনে রূপান্তরিত করেন।

যাদের নির্ভেজাল বুদ্ধিই নেই তারা সংস্কৃতি ও বিবেকের রক্ষক হতে পারেন না। যাদের নিজেদের বিবেক বিকৃত ও বিক্রীত, তারা সমাজ ও সংস্কৃতির বিবেক হতে পারেন না।

তারপরে পাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র (বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের উদ্গাতা), বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং পরে অন্য বহুজন যাঁদের নাম উল্লেখ করলে পাতা ভর্তি হয়ে যায়।

পরবর্তীকালে এই বুদ্ধিজীবীদের বহুজনই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনও বুদ্ধিজীবীদের। নেতৃত্বে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশেষ ভূমিকা ছিল তাঁর। ওই সময়ে তিনি ২৩টি দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন। যে সব গানের কোনো কোনোটির ভাষা পরিবর্তনের স্পর্ধা কোনো আত্মগর্বী আহাম্মক রাজনীতির ব্যবসাদার দেখাচ্ছেন।

ব্রতচারী সংগীত ও নৃত্য প্রণেতা গুরুসদয় দত্ত— ব্রতচারীতে একটি গান ও নৃত্য রচনা করেছেন— 'বাংলা ভূমির প্রেমে আমার প্রাণ হইল পাগল...'

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ গান ইংরেজ সরকার নিষিদ্ধ করলেও তাবৎ ভারতবাসীর স্বাধীনতার মন্ত্রই ছিল বন্দেমাতরম্। নাগপুরের নীল সিটি হাইস্কুলের ছাত্ররা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিয়ে ইন্সপেক্টরকে সংবর্ধনা জানায়। তাদের নেতা কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারকে (রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠাতা) স্কুল থেকে বিতাড়ন করা হয় (১৯০৪)।

প্রশ্ন উঠছে, বুদ্ধিজীবী কারা?

অনেক দার্শনিক বলেন যে, বুদ্ধিজীবী

হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক নির্দেশ করেন। তিনি সমাজের মুখপাত্র নন। তিনি সমাজের বিবেক।

পশ্চিমবঙ্গে এখন সেই 'বিবেক' যেন নিঃশেষ হয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় বসার আগে সম্ভবত এক রিজওয়ানুরকে ঘিরে মোমবাতি জ্বলেছিল বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী চেতনার শিকড় নিহিত ছিল অন্তত উনবিংশ শতাব্দীতে। এক সময় এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সাংবাদিক, সাহিত্যিক, সমালোচক, খ্যাতনামা অধ্যাপক, রাজনীতিকদের নানা বিষয়ে মতামত ছিল। রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিক্ষাচর্চা মোটামুটি একটি সূত্রে যুক্ত থাকত। কোনো বিষয়ে এঁদের সম্মিলিত চিন্তা বুদ্ধিজীবীদের মতামত বলে গ্রাহ্য হতো। এই বুদ্ধিজীবীরা ছিলেন যুক্তিবাদী ও চিন্তাশীল। সমাজের বিবেক রূপে কাজ করতেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গের সমাজে এক অভাবনীয় ঘটনা সব ঘটছে। ২৬ হাজার শিক্ষকের চাকরি গেল এককালীন। শিক্ষা জগতে ব্যাপক চুরি, রাজ্যের সমস্ত বিভাগে যাবতীয় রাহাজানি, ডাক্তারি কলেজ হাসপাতাল ও অন্যত্র ব্যাপক নারী নির্যাতন, অবৈধ অনুপ্রবেশ প্রভৃতি নানা বিষয়ের সংবাদ সংবাদপত্রের মূল শিরোনাম হচ্ছে। সাধারণ মানুষের দুর্নীতি ও চোরা চালান, সমস্ত দুর্নীতিতে মন্ত্রীদের যোগাযোগ, স্বরাষ্ট্র, চিকিৎসা ব্যবস্থা— কোনো সরকারি বিভাগই বাদ নাই— এতসব কাণ্ড ঘটেই চলেছে। যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবীদের কোথাও কোনো কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে না, কান পাতলেও না। এর কারণ কী? অথচ সমাজের নৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে যাঁরা প্রতিবাদে একদা অগ্রণী ভূমিকা নিতেন সমাজের বিবেক হিসেবে তাঁরা— সেই যে রিজওয়ানুরকে নিয়ে প্রতিবাদের মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন— তারা কোথায়? তাহলে কি ধরে নিতে হবে যে সেই বিবেকরা কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে গত ১৪-১৫ বছর ধরে কুম্ভকর্ণের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কুম্ভকর্ণও ছয় মাস পরে জেগে উঠতেন।

ভারতের রাজনীতিতেও, পরাধীনতার যুগে একান্ত সজীব এবং সক্রিয় ছিলেন প্রকৃত বুদ্ধিজীবীরা।

সর্বত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বুদ্ধিজীবীরা স্থান করে নিলেন। তারা হয়ে উঠলেন প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী। এখন তারা আর যুক্তিবাদী নন, সরকারবাদী। সরকারের অনুগ্রহভোগী।

১৯৭৫-এ যখন ভারতজুড়ে 'জরুরি অবস্থা জারি' হয় তখন বুদ্ধিজীবীরা বাধ্য হয়ে মুখ বন্ধ করেছিলেন। যারা বিরোধ করেছিলেন তারা জেল খেটেছেন।

১৯৭৭ সালে বুদ্ধিজীবীরা আর স্বাধীন থাকলেন না। তথাকথিত শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে তারা প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে গেলেন। হয়ে গেলেন সরকারের অংশীদার। সরকার-ভজা বুদ্ধিজীবী। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তারা সমধিক গুরুত্ব পেলেন। পশ্চিমবঙ্গ অ্যাকাডেমি, পাশ্চাত্য কলা কেন্দ্র, নন্দন, বইমেলা কমিটি প্রভৃতিতে তাদের ছিল চূড়ান্ত রাজনৈতিক প্রভাব। যারা সমাজের বিবেক তুলে ধরতেন তারা প্রায় সকলেই এইগুলির আশ্রয়ে চলে গেলেন। তাঁরা সরকারি সম্মান পেতে থাকলেন। সর্বত্র সরকারি প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় বুদ্ধিজীবীরা স্থান করে নিলেন। তারা হয়ে উঠলেন প্রাতিষ্ঠানিক বুদ্ধিজীবী। এখন তারা আর যুক্তিবাদী নন, সরকারবাদী। সরকারের অনুগ্রহভোগী। এঁদের নিজেদেরই বিবেক নাই, সমাজের বিবেক তাই হতে পারেন না।

রাজনৈতিক আওতার বাইরে তাও কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা 'বিবেকবান' হওয়ার যোগ্য ছিলেন। তাঁরাও এখন নেই।

মোটামুটি ২০১১ সালের পরে এই রাজ্যের সমাজ ব্যবস্থার সিলেবাস থেকে এই সাবজেক্টটি থাকল না। ফলে ওই সাবজেক্ট নিয়ে আর কেউ পড়াশোনা করলেন না। ফলে এই ১৪-১৫ বছরে আর কেউ ডিগ্রি অর্জন করতে পারেননি। সে ডিগ্রি অর্জন করার মতো মেধা ও মন জনসমক্ষে আর নাই। বুদ্ধিজীবীরা এখন হাওয়া হয়ে গেছেন। বাজারে আর মোমবাতি পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন বুদ্ধিভিত্তিক জীবনযাত্রা অনুপস্থিত। সবাই এখন সুবিধালোভী। রাজ্যে চলতি যাবতীয় অনাচার, অত্যাচার, চুরি, জোচ্চুরি, অর্থ তছরুপ— সমর্থন করার বুদ্ধি তৈরি হয়েছে। শুরু হয়েছে চটি চাটা-চাটির প্রতিযোগিতা। যে যত চাটতে পারবে সে তত পয়সা পাবে। এদের টিভিতে পাওয়া যায়। কেউ অধ্যাপক, কেউ আইনজীবী, কেউ চিকিৎসক, কেউ সিনেমা শিল্পী ইত্যাদি। যুক্তি না থাক, গলার জোর আছে। যৌক্তিক কথাবার্তা বললে এরা এতই চেঁচামেচি করেন— কারুর কথাই শোনা যায় না।

যাদের নির্ভেজাল বুদ্ধিই নেই তারা সংস্কৃতি ও বিবেকের রক্ষক হতে পারেন না। যাদের নিজেদের বিবেক বিকৃত ও বিক্রীত, তারা সমাজ ও সংস্কৃতির বিবেক হতে পারেন না। সত্য ও ন্যায্য কথা বলে শাসকের শাস্তিকে ভয় করেন যারা, তারা সমাজের বিবেক (বুদ্ধিজীবী) হতে পারেন না। যারা অর্থ এবং সম্মান লোভী তাঁরা সমাজের বিবেক হতে পারেন না। যারা সমাজ ও সমাজ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করেও কথা বলতে পারেন না— তারা বুদ্ধিজীবী হতে পারেন না।

আপাতত পশ্চিমবঙ্গে সে রকম মানুষের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু পরে যে সম্ভাবনা নাই সে কথাও ভাবা ঠিক নয়। একদা ইংরেজদের বিরুদ্ধে এই বঙ্গের বহু মানুষই দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা মৃত্যু ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন কিন্তু ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। তাঁরা প্রেরণা দিয়েছিলেন সৎ কর্মের 'অনুপ্রেরণায়', সেই প্রেরণা শেষ হয়ে যায়নি। আবার পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবীরা তৈরি হবেন। ভালো বা সৎ মরে না। রাজ্যের মানুষ আশায় বুক বাঁধছে। □

রাজ্য ভলিবল সংস্থায় কিছু অনভিপ্রেত ঘটনা

নিলয় সামন্ত

বেলেঘাটায় ৪৬তম সিনিয়র রাজ্য মহিলা নকআউট ভলিবল প্রতিযোগিতার টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে অংশ নিয়েছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে আর বারাসাতের নতুন পুকুর সঙ্ঘ। বেলেঘাটার সিআইডি মোড়ের কাছে অবস্থিত বেলেঘাটা বালক বৃন্দের মাঠে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছিল আটটি দল। চাম্পিয়ন ইস্টার্ন রেল, সাউথ ইস্টার্ন রেল, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, অগ্রবাণী, নতুন পুকুর সঙ্ঘ, বৈষ্ণবঘাটা উদয় সঙ্ঘ, চেতলা অগ্রণী ও হাওড়া কদমতলা অগ্রগামী সমিতি।

এই প্রতিযোগিতায় তিনটি অফিস দল অংশ নিয়েছিল এবং এই তিনটি দলই যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করেছে। বারাসাতের নতুন পুকুর সঙ্ঘ গেমের প্রথম দিকে কিছুটা করে লড়াই দিতে পারলেও পরে দ্রুত ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে। প্রত্যেক খেলাতেই দেখা গিয়েছে সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে, ইস্টার্ন রেলওয়ে আর পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের খেলোয়াড়দের দাপট।

তবে ছোট্ট মাঠে দু'পাশে অস্থায়ী গ্যালারি বানিয়ে স্থানীয় মানুষদের ভলিবল খেলা দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল বেলেঘাটার বালকবৃন্দ। প্রত্যেক দিনই প্রায় মাঠ দর্শকে ভর্তি থাকতো। তারা করতালির ধ্বনি দিয়ে মেয়েদের উৎসাহিত করে গিয়েছে সব সময়।

ফাইনাল যে দুটো অফিস দলের মধ্যে হবে তা বলাই বাহুল্য। ইস্টার্ন আর সাউথ ইস্টার্নের সেই লড়াইতে জয়ী হলো ইস্টার্ন রেলওয়ে। বেলেঘাটা বালকবৃন্দ ক্লাব আয়োজিত এই ভলিবলের ফাইনালে ইস্টার্ন রেল ৩-০ সেটে হারালো সাউথ ইস্টার্ন রেলকে। ম্যাচের শুরুতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হলে তৃতীয় সেটে ইস্টার্ন রেল তাদের চিরাচরিত দাপট দেখিয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ। চেতলা অগ্রণী পেয়েছে চতুর্থ স্থান।

তবে খেলা নয়। রাজ্য ভলিবলে রথিন রায়চৌধুরী আর পল্টু রায়চৌধুরী নামটা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এবার তার বিরোধী গোষ্ঠী প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌতম মোহন চক্রবর্তী নেতৃত্বে উঠে পড়ে লেগেছে। সেই নিয়ে বিস্তর গোলমাল। তবে, ঘটনার কেন্দ্রে পৌঁছনোর আগে ফিরে যাওয়া যাক ৯০-এর দশকে। ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ভলিবল সংস্থার সচিব হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসেন রথিন রায় চৌধুরী ওরফে পল্টু। তৎকালীন রাজ্য প্রশাসনের দায়িত্বভার ছিল বামপন্থীদের হাতে। সেই সময় আর্থিকভাবে চাঙ্গা ছিল না রাজ্য ভলিবল ফেডারেশন। টাকা জোগাড় করা থেকে শুরু করে টুর্নামেন্ট আয়োজন, সবটাই কার্যত একা হাতে সামলাতেন পল্টুবাবু।

কিন্তু সময় বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মানসিকতা আমূল পরিবর্তন হয়। ধীরে ধীরে রাজ্য ভলিবল সংস্থায় চালু হয় একনায়কতন্ত্র। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নির্বাচন না করে সচিবের সিংহাসনে বসে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়দের উপর ছড়ি ঘোরাতে থাকেন তিনি, এমনটাই অভিযোগ করছেন মহামায়া চৌধুরী, সুরজিত মুখোপাধ্যায়, রঞ্জন ঘোষ, প্রসেনজিৎ দত্ত, বাসন্তী দাস প্রমুখ।

ভারতীয় ভলিবল দলের কোচ মহামায়া চৌধুরী বলেন, "বর্তমানে ভলিবল টেন্টে রাজ্য ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রায় ১৫০ যুবককে তাঁবুতে এনে ঝামেলা করেন পল্টুদা। আমাদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। এই ভাবে আর মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এখানে প্রচুর মেয়ে রয়েছে। তারা বাইরে থেকে খেলতে আসে। তাদের সুরক্ষার বিষয়টা নিয়ে আমরা খুবই চিন্তিত।" প্রাক্তন খেলোয়াড় গোবিন্দ ভট্টাচার্য বলেন, 'সংস্থার তহবিলে একটা সময় ৫ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু সেই টাকা কোন খাতে কীভাবে ব্যবহার হয়েছে, তা কেউ জানে না। সম্প্রতি, পল্টুদা কলকাতা থেকে দিল্লি যাওয়ার জন্য সংস্থার তহবিল থেকে ৭২ হাজার টাকা নিয়ে শুধুমাত্র বিমানের টিকিট কেটেছেন। সামান্য দিল্লি যাওয়ার জন্য বিমানের এত ভাড়া হতে পারে তা আন্দাজ করাও কঠিন বিষয়।'

বর্তমানে ভলিবল সংস্থার সভাপতি পদে বসানো হয়েছে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম'কে। সূত্রের খবর, তিনিও খুব একটা তাঁবুতে আসেন না। তবে রথিনবাবু আশ্বাস দিয়েছেন ২০২৭ সালে নির্বাচন করবেন। কিন্তু তা মানতে নারাজ প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কোচেরা। জানা যাচ্ছে, পল্টুবাবুর জায়গায় খুব শীঘ্রই সচিব পদে বসতে চলেছেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রীর ভাই স্বরূপ বিশ্বাস। ☐

পঞ্চতন্ত্রের গল্প

নবাঙ্কুর

নীলবর্ণ শেয়াল

এক বনে চণ্ডরব নামে এক শেয়াল বাস করত। এক রাতে সে খাবারের খোঁজে বের হয়ে কখন যে বনের সীমানা পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছে তা খেয়ালই করেনি। আর তখনই কয়েকটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। শেয়াল ছুটতে ছুটতে এক ধোপার বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সেখানে একটা নীলগোলা জলের গামলা ছিল। পড়বি তো পড় শেয়াল ওই গামলার মধ্যেই পড়ে গেল। গামলা থেকে যখন উঠল,তখন তার গায়ের রং পালটে একেবারে নীলরঙের হয়ে গেছে।

তাড়া করে আসা কুকুরগুলো ওই নীলবর্ণের শেয়ালকে দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। তারা ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

শেয়ালের এবার কোনো ভয় নেই। সে বনের দিকে যেতে শুরু করল। বনের মধ্যে একটা নীলরঙের জন্তুকে ঢুকতে দেখে অন্যান্য জীবজন্তু সিংহ, বাঘ, হাতি, নেকড়ে, মোষ, খরগোশ সবাই খুব ঘাবড়ে গেল। তারা ভাবল এ তো এক ভয়ংকর জীব, এখানে না থাকাই ভালো। তারা যে যেদিকে পরল পালিয়ে যেতে লাগল।

চণ্ডরব বুঝল, সবাই তাকে দেখে খুব ভয় পেয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটাই সুযোগ। সে চিৎকার করে বলল, ওহে, তোমরা পালাচ্ছ কেন? আমাকে ভয় কেন? শোনো, কাছে এসো।

বনের জন্তুরা নিশ্চিন্ত হলো। তারা নিজের নিজের আস্তানা ছেড়ে বেরিয়ে এল। চণ্ডরব তাদের উদ্দেশে বলল, আমার নাম ককুদদ্রুম। ঈশ্বরের নির্দেশে আমি এই বনের রাজা হয়ে এসেছি। তোমরা আমার প্রজা।

তখন সবাই যেন একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। ধীরে ধীরে তারা কাছে এসে দাঁড়াল। সিংহ বলল, বলুন প্রভু, আমরা আপনার জন্য কী করতে পারি?

চণ্ডরব তার রাজসভা সাজাল। সিংহ হলো তার মন্ত্রী। রাজপ্রাসাদ দেখার দায়িত্ব পড়ল বাঘের উপর। হাতি, চিতা, নেকড়ে সবারই কোনো না কোনো দায়িত্ব পড়ল। কেবল কোনো দায়িত্ব পেল না তার জাতভাইয়েরা। সে তাদের সঙ্গে একটি কথাও বলল না। এমনকী তাদের ঘাড়ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হলো।

বনের শেয়ালরা কিন্তু চিনতে পারল ওই দুষ্টু শেয়ালকে। তারা অপমান সহ্য করল কিন্তু মুখে টুঁ শব্দটি করল না।

শেয়াল চণ্ডরব পাত্র-মিত্রদের নিয়ে মহাসুখে তার রাজ্যপাট চালাতে লাগল। বাঘ-সিংহরা বনে বনে ঘুরে শিকার ধরে আনে। চণ্ডরব রাজার নীতি মেনে সবাইকে একটু ভাগ দিয়ে নিজে বেশিটা খায়।

বেশ মহাসুখে দিন কাটছে। কিন্তু হঠাৎ এক রাতে ঘটে গেল বিপত্তি। রাজা ককুদদ্রুম তার সভাসদদের নিয়ে নানা আলোচনায় মগ্ন। চারিদেকে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। এমন সময় বনের নিস্তব্ধতাকে ভেঙে একসঙ্গে ভেসে এল অনেক আওয়াজ — ‘হুক্কা...হুয়া...।’

শেয়াল, কুকুর এইসব প্রাণীর স্বভাব হলো তাদের জাতের কেউ যদি ডেকে ওঠে, তাহলে যে যেখানে থাকুক ডেকে উঠবে। নিজের জাতভাইদের আওয়াজ শুনে শেয়াল চণ্ডরবের মনে ফুর্তি জেগে উঠল। তার গায়ের লোম খাড়া হলো। চোখে জল গড়িয়ে পড়ল। সে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। আকাশের দিকে মুখ তুলে জাতভাইদের সঙ্গে গলা মেলাল--- হুক্কা...হুয়া...।

ব্যাস্, আর যায় কোথায়! কারও বুঝতে বাকি রইল না, এটা একটা তুচ্ছ শেয়াল। তাদের ধোঁকা দিয়েছে। লজ্জায় তখন তাদের মাথা হেঁট।

---তবে রে ব্যাটা শেয়াল! সকলে একসঙ্গে চণ্ডরবের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তার দেহটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল।

ছোটো বন্ধুরা, মনে রাখবে, বেশিদিন কাউকে ঠকিয়ে রাখা যায় না।

সংগৃহীত

জাতীয় উদ্যান

বাল্মীকি

বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান বিহার রাজ্যের পশ্চিম চম্পারণ জেলায় অবস্থিত। এর ৮৯৯.৩৮ বর্গকিলোমিটার। এটি ১৯৫০ সালের প্রথম দিকে বাল্মীকি নগরের বিস্তৃত বনভূমি বেত্তিয়ারাজ ও রামনগর রাজের মালিকানাধীন ছিল। ১৯৯০ সালে একে জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়। এটি দেশের ১৭তম ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার। এই উদ্যানে ২০০০ রকমের গাছপালা থাকলেও শালগাছের আধিক্য রয়েছে। জীবজন্তুর মধ্যে রয়েছে বাঘ, গণ্ডার, হাতি, ভালুক। রয়েছে ২৫০ প্রজাতির পাখি। পাঁচ জাতের পায়রা রয়েছে। ৪০ প্রজাতির সরীসৃপ এবং ৩০০০ প্রজাতির প্রজাপতি আছে। জনশ্রুতি, এই উদ্যানে বসে বাল্মীকি মুনি রামায়ণ রচনা করেছেন। মার্চ থেকে অক্টোবর উদ্যান পরিদর্শনের ভালো সময়। এই উদ্যানেই রয়েছে বাল্মীকি আশ্রম।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯৩

পৃষ্ঠতঃ (পেছনে)

গৃহস্য পৃষ্ঠতঃ বৃক্ষঃ অস্তি।

বাড়ির পেছনে গাছ আছে।

অভ্যাস কুর্মঃ –

আশ্রমস্য পৃষ্ঠতঃ গৌশালা অস্তি।

সঙ্গণকস্য পৃষ্ঠতঃ পিত্রঃ অস্তি।

দ্বারস্য পৃষ্ঠতঃ কুঞ্চিকা অস্তি।

প্রয়োগং কুর্মঃ––

পৃষ্ঠতঃ দ্বারা বাক্যাণি রচয়াম

(**পৃষ্ঠতঃ** দ্বারা বাক্য রচনা করবো)

ভালো কথা

পাঁচ লক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠ

গত ৭ ডিসেম্বর রবিবার কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে পাঁচলক্ষ কণ্ঠে গীতাপাঠের আয়োজন হয়েছিল। সেদিন সকালে আমি মায়ের সঙ্গে ২৬ নং কার্যালয়ে এলাম। তারপর সুকেশদা, দিব্য ও ওর মা, অবিঘ্নদার মা আর ওর দিদিমা আর কৃষ্ণদা রওনা হলাম। দু'বার বাস বদল করে যখন আমরা মাঠে ঢুকলাম তখনই খুব ভিড়। মাঠে ঢোকার সময়ই আমাদের হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগে করে বিস্কুট, চিঁড়েভাজা, জলের বোতল আর একটি গীতাবই দিল। আমরা ৪নং গেট দিয়ে ঢুকে গিয়ে এক জায়গায় বসলাম। তখন মঞ্চে ভাষণ চলছিল। মঞ্চে বসে ছিলেন অনেক বড়ো বড়ো সাধু সন্ন্যাসী। ঠিক ১২টার সময় গীতাপাঠ শুরু হলো। প্রথম, নবম আর অষ্টাদশ অধ্যায় পাঠ হলো। শেষ হলে আমরা বাড়ি রওনা হলাম। এদিন আমার খুব আনন্দ হয়েছিল।

দীপমাল্য সাউ, পঞ্চম শ্রেণী, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) রি আ ণী

(২) আ বি দি

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) বি চি চ অ ল ত্ত

(২) ত মৃ র সা গ অ

৮ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) ইহজগৎ (২) ঈশ্বরভক্তি

৮ ডিসেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) উলটাপালটা (২) এলাকাভিত্তিক

(১) শিবম রায়, রায়নগর, ডায়মন্ড হারবার, দঃ ২৪ পরগনা। (২) স্বাতী সরকার, গাজল, মালদা। (৩) কৃত্তিকা মণ্ডল, মকদুমপুর, মালদা। (৪) হৃতিকা মণ্ডল, জয়শ্রী, বাঁশদ্রোণী, কল-৭০।

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/ সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪ ৯০৫১৭২১৪২০

PIONEER®
EXERCISE BOOK

Manufacturer of Exercise Book
& Office Stationery

PIONEER PAPER & STATIONERY PVT. LTD.

74, Beliaghata Main Road, Kolkata 700 010 India. Phone +91 33 2370 4152 / 2373 0556, Fax +91 33 2373 2596
Email pioneerpaperco@gmail.com. www.pioneerpaper.co

নিজের স্বপ্ন গুলোকে বাস্তবে রূপ দিন

মিউচুয়াল ফান্ডে SIP করুন

(সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান)

কি জন্য করবেন?

- ★ RETIREMENT PLANNING.
- ★ CHILDREN EDUCATION FUND.
- ★ DAUGHTER MARRIAGE FUND.
- ★ WEALTH CREATION.
- ★ ANY OTHER SHORT & LONG TERM PLAN

DRS INVESTMENT 8240685206 9748978406

Email: drsinvestment@gmail.com || Website: www.drsinvestment.com

NPS | Mutural Fund | Insurance | Mediclaim | Fixed Deposit | Bond

'সঙ্ঘ' মানে সম্ভব

দুর্গাপদ ঘোষ

দেবতাত্মা হিমালয় থেকে মর্ত্যভূমে অবতরণ এবং প্রবাহ পথে গঙ্গার সামনে মহাশক্তিশালী ঐরাবত-সহ নানা বাধা এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ভগীরথের ইচ্ছাশক্তি এবং পতিত পাবনী মা গঙ্গার গতির সামনে কোনো বাধাই টেকেনি। সমস্ত বাধা অতিক্রম করে মা গঙ্গা তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছে। গোমুখ থেকে আত্মপ্রকাশের আগে তার শক্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে কেউ অবহিত ছিল না। ১৯২৫ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের নাগপুর নামক 'গোমুখ' থেকে সঙ্ঘ-ভগীরথ ডাঃ কেশব বলিরাম হেডগেওয়ারের ইচ্ছাশক্তিতে আত্মপ্রকাশিত হয় ভারতাত্মারূপী এমন এক সমাজ-সংগঠন যার শক্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে কারও কোনও স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আজ সেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষে সমগ্র বিশ্ববাসী তাঁর ইচ্ছাশক্তির স্বরূপ প্রত্যক্ষ করে সঙ্ঘের কার্যকর্তাদের অন্তর্নিহিত দৃঢ়তা উপলব্ধি করতে পারছেন।

সঙ্ঘ সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে সঙ্ঘের কাজ হলো পরিস্থিতি নিরপেক্ষ। সমাজের তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি যখন যেমনই হোক না কেন, সঙ্ঘের নিজস্ব কার্যপদ্ধতি এবং নিজস্ব গতিতে তা বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। পরিস্থিতির স্বপক্ষে চলা গড্ডলিকা প্রবাহে সঙ্ঘ ভাসিয়ে দেয় না। পরিস্থিতি সাপেক্ষে সঙ্ঘ তার নিজের চিন্তাদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে কোনও সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে না। কোনও পরিস্থিতিতেই কারও বা কোনও কিছুর কাছে নতি স্বীকার করে না। বরং কোনও বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে সামনে যে পরিস্থিতিই বাধা হয়ে দাঁড়াক না কেন, তাকে অতিক্রম করে সাফল্য লাভ না করা পর্যন্ত তা থেকে বিচ্যুত হয় না। নিরস্ত হয় না। এর বহু উদাহরণ রয়েছে। এখানে খুব সামান্য কয়েকটি উদাহরণ যথাসম্ভব সংক্ষেপে তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো।

বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি

অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের ওপরে র‍্যাডক্লিপের কলমের লাল কালির আঁচড়ের দাগ মোতাবেক দেশভাগের ভয়ঙ্কর বিভীষিকার কালো ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল সমগ্র হিন্দু জীবন। পূর্ববঙ্গ এবং উত্তর-পশ্চিম পঞ্জাবে মুসলমানদের জেহাদি রক্তলোলুপতার শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর ভিটেছাড়া হয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্বপঞ্জাবে আগমন ঘটতে লাগল। তখনো সঙ্ঘের শক্তি তেমন মজবুত হয়নি। পা তেমন শক্ত হয়নি। সঙ্ঘ যেহেতু নীতিগতভাবে কারও কাছ থেকেই কোনওরকম সাহায্য বা অনুদান গ্রহণ করে না সেজন্য আর্থিক অবস্থা এতটাই খারাপ ছিল যে দেশের বিভিন্ন স্থানের বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের অনেক সম্পন্ন পরিবার থেকে সঙ্ঘকাজের জন্য বেরিয়ে আসা প্রচারকদের মাত্র একবেলা একমুঠো ভাত-ডাল-রুটি নিজের হাতে বানিয়ে খেয়ে দিন কাটাতে হতো। শহরে-গ্রামে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাওয়া- আসা করে সঙ্ঘের শাখা শুরু করা এবং চালাতে হতো। কিন্তু তার মধ্যেও বাস্তুহারা হয়ে আসা শরণার্থীদের নিদারুণ পরিস্থিতি দেখে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে চুপ করে বসে থাকতে পারেননি সঙ্ঘের কার্যকর্তারা। দ্বিতীয় সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর এবং তৎকালীন সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক একনাথজীর প্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা হলো 'বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি'। পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি একাধিক জায়গায় খোলা হলো উদ্বাস্তু ত্রাণ শিবির। রাজ্যব্যাপী স্বয়ংসেবকদের বাড়ি বাড়ি থেকে খাবার সংগ্রহ করে পাঠানো হতে থাকল শিবিরগুলিতে। বেশ কিছুদিন ধরে শিবিরগুলো চালাতে হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে কখনও বন্ধ করে দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থাতেও এই সমিতির মাধ্যমে স্বয়ংসেবকরা সেদিন যে উদ্বাস্তু ত্রাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বহু রকমের বাধাবিপত্তির মুখোমুখি হয়েও সেখান থেকে এক কদমও পিছিয়ে আসেনি। সেই বাস্তুহারা সহায়তা সমিতির অস্তিত্ব এখনও বর্তমান রয়েছে।

অন্যদিকে পঞ্জাব সীমান্তে বাস্তুহারা সহায়তা সমিতি গঠন করা হয়নি ঠিকই, কিন্তু সেখানেও দাঙ্গাবিধ্বস্ত, আহত শরণার্থীদের উদ্ধার, চিকিৎসা এবং অন্যান্য ত্রাণের জন্য অনেকগুলো শিবির তৈরি করা হয়েছিল সঙ্ঘের পক্ষ থেকে। কোনোরকম সরকারি সাহায্য ছাড়াই সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা নিজেদের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিরন্তর সেবাকাজ চালিয়ে গেছেন।

কাশ্মীরের ভারতভুক্তি

দেশভাগের পরপরই কাশ্মীরকে গ্রাস করার জন্য 'অপারেশন গুলমার্গ' নাম দিয়ে 'হানাদার'-এর ছদ্মবেশে পাক সেনারা আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৪৭ সালের ২২ অক্টোবর ওই হামলা শুরু হতেই কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিংহের নিরাপত্তা বাহিনীতে যত

মুসলমান পুলিশ ছিল তাদের বেশিরভাগই পাক হানাদারদের পক্ষ নিয়ে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে ধরতে আরম্ভ করে। তার ওপর তখন জম্মুর দিক থেকে শ্রীনগর তথা কাশ্মীর উপত্যকায় যাওয়ার মতো সুগম কোনও রাস্তা ছিল না। বানিহাল তো অনেক পরের কথা, কোনো টানেলই ছিল না। তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছনোর একমাত্র উপায় ছিল বিমান। শ্রীনগরে সেই বিমানবন্দরের অবস্থাও ছিল হতদরিদ্র। কালেভদ্রে যাতায়াত ছিল অত্যন্ত ঝুঁকির। হরি সিংহ তাঁর রাজ্য কাশ্মীরকে তখনও সরকারিভাবে ভারতভুক্ত করেননি। আর তা করলেও ভারতীয় সেনাদের বিমানে পাঠানোর ব্যাপারটা ছিল প্রায় অসম্ভব। বিশেষ করে তার রানওয়ের বিভিন্ন জায়গা ছিল ভাঙাচোরা। অবিলম্বে তা মেরামত করে সেনা নামানোর মতো জায়গায় নিয়ে আসার মতো ক্ষমতা ও পরিস্থিতি তখন হরি সিংহ সরকারের ছিল না। ওদিকে পাক হানাদাররা ধেয়ে আসছিল শ্রীনগরের দিকে। এরকম পরিস্থিতির মুখে নিরূপায় হয়ে হরি সিংহ প্রায় ঠিকই করে ফেলেছিলেন কাশ্মীরকে পাকিস্তানভুক্ত করবেন। কেননা, ভারতভুক্ত হলে ভারতীয় সেনারা সেখানে পৌঁছনোর অনেক আগেই পাক সেনারা কাশ্মীর দখল করে নিতে পারে। কাশ্মীরের ক্ষেত্রে কী ভয়ঙ্কর অবস্থা হয়েছিল তা যে কোনও মানুষ তা খুব সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে কথা বলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সিদ্ধান্ত নিলেন, ভারতমাতার মাথার মুকুটকে পাকিস্তানের পায়ের তলায় লুটোতে দেওয়া হবে না। সর্দার প্যাটেল সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীকে একখানা বিশেষ বিমানে কাশ্মীর পাঠালেন। শ্রীগুরুজী মহারাজা হরি সিংহকে আশ্বস্ত করলেন যে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা যে যাঁর মতো ঘরের খাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়ে দিনরাত এক করে পাক সেনারা এসে হাজির হবার আগেই, ঠিক সময়মতো রানওয়ে মেরামত করে দেবেন যাতে ভারতীয় সেনারা বিমানে এসে নামতে পারে। শ্রীগুরুজীর ওপর মহারাজার অগাধ আস্থা ছিল। সফল আলোচনান্তে শ্রীগুরুজী ফিরে আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ২৬ অক্টোবর হরি সিংহ সরকারি বা আইনিভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে স্বাক্ষর করলেন। আর তা করা মাত্রই রানওয়ে মেরামতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন স্বয়ংসেবকরা। কয়েক জনের প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জিত হলো। কিন্তু সঙ্ঘের ওই সিদ্ধান্ত ও দৃঢ়তার কারণে ভারতীয় সেনারা প্রথম কাশ্মীরে অবতরণ করতে পারে এবং সেদিন ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে কাশ্মীরের একাংশ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল। বাকি অংশ কেন পাকিস্তানের জবরদখলে থেকে গেছে সে ইতিহাস ভিন্ন। তা এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। শুধু এইটুকুই বলার যে, সেদিন কী বিষম পরিস্থিতির মুখে স্বয়ংসেবকরা ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, প্রচণ্ড প্রতিকূল পরিস্থিতিতে প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে সাফল্য লাভ করেছিল বহু মানুষ তা কল্পনাও করতে পারবেন না।

কন্যাকুমারীতে বিবেকানন্দ শিলা স্মারক নির্মাণ

স্বয়ংসেবকরা যে সব সময় সঙ্ঘের নামে কিংবা সঙ্ঘের ব্যানারে সবকিছু করে থাকেন তা নয়। বরং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গোটা সমাজকে সঙ্গে নিয়ে চলার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে তা করে থাকেন। ১৯৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি ছিল স্বামী বিবেকানন্দের জন্মশতবার্ষিকী। সঙ্ঘের কার্যকর্তারা সিদ্ধান্ত নিলেন কন্যাকুমারীতে সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত যে শিলাখণ্ড যার নামকরণ আগেই হয়েছিল 'বিবেকানন্দ শিলা', সৈকতভূমি থেকে আধ কিলোমিটার মতো দূরে সেই শিলাখণ্ডের ওপরে স্বামীজীর স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করা হবে। সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত, তার সঙ্গে স্বামীজীর গুরুভাই স্বামী অখণ্ডানন্দের কাছে দীক্ষিত তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজীর আশীর্বাদ ও প্রেরণা–– অতএব যত বাধা, যত বিপত্তিই সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াক না কেন, সঙ্ঘ তা করবেই, সমগ্র হিন্দু সমাজের মনে এই বিশ্বাস এবং আস্থা অটুট ছিল। সঙ্ঘের তৎকালীন অখিল ভারতীয় বৌদ্ধিক প্রমুখ ছিলেন একনাথ রাণাডে। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কাজে নেমে পড়লেন। কয়েক দিনের মধ্যেই সমাজের কিছু বরেণ্য লোকেদের নিয়ে তৈরি করা হলো 'স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মারক সমিতি'। কিন্তু স্বামীজীর মতো বিশ্ববরেণ্য সন্ন্যাসীর স্মৃতিতে মন্দির নির্মাণের সামনে ও নানা মহল থেকে প্রবল বাধা সৃষ্টি হতে লাগল। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসের আগে সমিতিকে নথিভুক্ত পর্যন্ত করতে দেওয়া হলো না। শিকাগো বক্তৃতার পর দেশে ফিরে এলে যে তামিলনাড়ুর মানুষরা স্বামীজীর বাহনকে নিজেদের কাঁধে বহন করেছিলেন সেই তামিলনাড়ুর তৎকালীন কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী ভক্তবৎসলম্ সরকারের তরফে আপত্তি এল সবার আগে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন যে তিনি কিছুতেই এটা হতে দেবেন না। আপত্তি আসতে লাগল কেন্দ্র (নেহরু) সরকারের দিক থেকেও। তখন কেন্দ্রে শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ডঃ হুমায়ুন কবির যিনি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজিতে এমএ পাশ করেছিলেন, তিনি তো এমনও মন্তব্য করলেন যে ওই শিলার ওপর মন্দির নির্মাণ হলে ওখানকার 'নৈসর্গিক সৌন্দর্য' বিনষ্ট হবে। এছাড়া প্রায় প্রত্যক্ষভাবে বাধা দিতে এগিয়ে এল স্থানীয় মৎস্যজীবীরা যাদের বেশিরভাগই খ্রিস্টান সম্প্রদায়ভুক্ত। রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকারের নেতিবাচক মানসিকতায় তাদের বিরোধিতার মাত্রা অনেক বেড়ে গেল। তৈরি হলো প্রায় সংঘাতের মতো পরিস্থিতি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ একনাথজী সঙ্ঘের সিদ্ধান্তে অটল থেকে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন। কয়েক দিনের মধ্যে ১৭ জানুয়ারি শিলার ওপরে মন্দির নির্মাণ সংক্রান্ত একটি 'ট্যাবলেট' (ফলক) বসান হলো। কিন্তু পরদিনই দেখা গেল জেলেরা তা উপড়ে ফেলে সেখানে তাদের রিলিজিয়নের মাতা মেরি-র নামাঙ্কিত ফলক বসিয়ে দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে গেলেন একনাথজী। কার্যত প্রত্যাখ্যাত হতে হলো। রণে ভঙ্গ না দিয়ে গেলেন সাংসদদের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে লিখিত সম্মতি পাবার জন্য। কিন্তু বেশিরভাগ সাংসদই মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এতটুকুও না দমে নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ সাংসদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মোরারজী দেশাই। সেইটুকুকে পুঁজি করে এবং চরকির মতো ঘুরে সারা দেশ প্রায় তোলপাড় করে ফেললেন। সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সর্বত্র প্রচারে নেমে পড়লেন। কিছুদিনের মধ্যেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো যাতে সরকারের মধ্যে ডামাডোল তৈরি হতে শুরু করল। অবশেষে আদায় করা গেল অনুমতি। সর্বসাধারণের দানের অর্থে নির্মিত হলো স্বামী বিবেকানন্দ শিলা স্মারক মন্দির। প্রসঙ্গত, ১৯৭০ সালের ২ সেপ্টেম্বর তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভিভি গিরি ওই মন্দিরের উদ্বোধন করেন। তখন কেন্দ্রে ছিল ইন্দিরা গান্ধীর সরকার।

জরুরি অবস্থার প্রত্যাহারে সঙ্ঘের আন্দোলন

ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন মাঝরাতে সারা দেশে জরুরি অবস্থা জারি করে দিলেন। তিনি জানতেন যে, আর কেউ প্রতিবাদে নামুক না নামুক সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা এটা বরদাস্ত করবে না। এহেন গণতন্ত্র হত্যার প্রতিবাদে মাঠে নামবেই। সেজন্য একই সঙ্গে সঙ্ঘকে কোনও কারণ কিম্বা যুক্তি ছাড়াই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দিলেন। শুরু হলো ধরপাকড়। অন্যান্য কিছু রাজনৈতিক নেতার পাশাপাশি সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয়দেরও জেলে ভরে দেওয়া হলো। কিন্তু সঙ্ঘকে দমানো গেল না। স্বয়ংসেবক কার্যকর্তারা মাঠে-ময়দানে প্রকাশ্যে ধ্বজোত্তোলন করে শাখা করা বন্ধ রাখলেন বটে কিন্তু নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক রেখে এবং নিয়মিত মিলিত হয়ে সম্মেলন করে যেতে থাকলেন। প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়ে প্রতিবাদ কর্মসূচি চালিয়ে যেতে লাগলেন। স্বয়ংসেবকরা ঠিক করেছিল যতদিন পর্যন্ত ওই স্বৈরাচারী জরুরি অবস্থার অবসান না হবে ততদিন নিরস্ত হবে না। হয়ওনি। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, কিছুদিন পর থেকে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা প্রকাশ্যে রাস্তায় নেমে শান্তিপূর্ণ সত্যাগ্রহ করে নিজেরাই ধরা দিয়ে 'জেল ভরো' আন্দোলন চালিয়ে যেতে লাগলেন। পরে লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের মতো নেতারা আন্দোলন করে ইন্দিরা সরকারের ভিত নড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে কিন্তু শুরু করেছিল সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা। ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ জরুরি অবস্থার অবসান পর্যন্ত ২১ মাসে ওই প্রতিবাদ আন্দোলনে ১ লক্ষ ৪০ হাজার স্বয়ংসেবক জেলবন্দি হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত কীভাবে ওই স্বৈরাচারের অবসান ঘটে এবং ইন্দিরা গান্ধীকে জেলে যেতে হয় আশা করি তার বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন নেই।

শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রাম

১৯৮৪ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন শুরু করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। ১৯৬৪ সালের ২৯ আগস্ট এই সংস্থাটি তৈরি হয় সঙ্ঘের প্রেরণাতেই। প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সঙ্ঘের তৎকালীন সরসঙ্ঘচালক শ্রীগুরুজী। ওই আন্দোলন যার ব্যাপ্তির জন্য সবাই এককথায় 'দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম' বলে বর্ণনা করেছেন তার প্রধান নেতৃত্বে ছিলেন অশোক সিংঘল। তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কাজে আত্মনিবেদিত হবার আগে পর্যন্ত ছিলেন সঙ্ঘের প্রচারক। শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির ধ্বংস করে তার ওপর তৈরি করা বাবরি ধাঁচা হটিয়ে পুনরায় রামমন্দির নির্মাণের লক্ষ্যে ১৯৪৯ সালে একজন সন্ত পরমহংস রামচন্দ্র দাস যে প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন ১৯৮৩ সালে স্বয়ংসেবকরা তাকে বাস্তবায়িত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো অশোক সিংঘলকে প্রত্যক্ষভাবে সঙ্ঘকাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দায়িত্বে নিযুক্ত করা হয়। হিন্দু জাগরণের লক্ষ্যে সে বছর তাঁর নেতৃত্বে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করা হয় 'একাত্মতা যজ্ঞ রথযাত্রা'। পরের বছর থেকে শুরু করা হয় রামমন্দির আন্দোলন। কিন্তু রামমন্দির বিরোধী তথা বাবরি মসজিদপন্থীরা কীভাবে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে ইতিহাস সুবিদিত। করসেবকদের সঙ্গে অনেক সাধুসন্তও লাঠি-গুলি খেয়ে হতাহত হয়েছেন, আইনি জটিলতায় প্রচুর সময় নষ্ট হয়েছে। করসেবা করতে গিয়ে বহু রামভক্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন, গুলি খেয়েছেন। ছলচাতুরি থেকে শুরু করে বলপ্রয়োগ, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনওকিছু বাদ যায়নি। কিন্তু সিদ্ধান্ত ছিল 'রামলালা হম আয়েঙ্গে, মন্দির য়হী বনায়েঙ্গে।' আজ অযোধ্যায় সেই বাবরি ধাঁচার জায়গায় কীভাবে আকাঙ্ক্ষিত শ্রীরামজন্মভূমি মন্দির পুনর্নির্মিত হয়েছে সবাই জানেন। ২০২৪ সালের ২২ জানুয়ারি তার গর্ভগৃহে স্থাপন করা শ্রীরামলালার বিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ২০২৫ সালের ২৫ নভেম্বর মূল মন্দিরের শিখর চূড়ার ওপরে ধর্মধ্বজ উত্তোলন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন থেকে শুরু করে সমস্ত প্রধান অনুষ্ঠানেই তাঁর পাশে ছিলেন সঙ্ঘের বর্তমান সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। কেবল ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে নানা রকমের কর্মযজ্ঞে সঙ্ঘের অবিশ্বাস্য কর্মকাণ্ড ও সাফল্য দেখেছেন এবং দেখছেন। সঙ্ঘ আরম্ভ হবার প্রায় শুরু থেকেই বিভিন্ন মহল, এমনকী সংবাদমাধ্যমগুলোর অধিকাংশই দীর্ঘকাল যাবৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় সঙ্ঘের বিরোধিতা নয়তো সংবাদ প্রকাশ না করে (ব্ল্যাকআউট) অথবা একপেশে সম্প্রচার এবং বিরূপ সমালোচনা চালিয়ে এসেছে। তা সত্ত্বেও অবিরামভাবে প্রবাহিত হয়ে আসা সঙ্ঘের এই শতবর্ষে উপনীত হওয়া দেখে আজ সবাই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন, আশ্বস্ত হচ্ছেন 'সঙ্ঘ আছে বলেই সব সম্ভব হচ্ছে'। সঙ্ঘ থাকলে কোনও কিছু অসম্ভব নয়। সঙ্ঘ মানে সম্ভব। সঙ্ঘের এগিয়ে চলার গতি, অমৃতধারা গঙ্গার এগিয়ে চলার গতির মতো নিরবচ্ছিন্ন, বাধা অতিক্রমকারী ইচ্ছাশক্তির মতো। তিন-তিনবার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেও যাকে নিরস্ত করা যায় না, যার পবিত্র আদর্শকে কলুষিত করা যায় না। সম্ভব নয়। শতরকম প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও যার কর্মধারা নিরপেক্ষ। □

শোক সংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শালবাড়ি খণ্ডের প্রবীণ স্বয়ংসেবক নব্যহরি ডাকুয়া গত ২৯ নভেম্বর পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের দক্ষিণ-পূর্ব বিভাগের বাঘাযতীন ভাগের বিজয়গড় শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক রণজিৎ সরকার গত ১৩ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির পূর্বতন উত্তরবঙ্গ সম্ভাগ সহ কার্যবাহিকা শ্রীমতী পুতুল শর্মা গত ৮ ডিসেম্বর শিলিগুড়ির নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। তিনি তাঁর স্বামী, ১ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তাঁর পুরো পরিবার সঙ্ঘময়। পুত্র সৌভিক শর্মা ক্রীড়া ভারতীর কার্যকর্তা। দুই কন্যাই সেবিকা সমিতির সেবিকা। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পুতুলদি সমিতির কাজে সক্রিয় ছিলেন।

মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গায় বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে বিষাক্ত হতে পারে জেলার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি

হুমায়ুন পশ্চিমবঙ্গে আবার সেই বিবাদের স্মৃতিকে অবলম্বন করে মসজিদ গড়তে চেয়ে কি ইঙ্গিত দিতে চাইছে? বাবর কি ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষ? আবার সামনের কয়েকশো বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ চলতে থাকবে?

ড. বিনয়ভূষণ দাশ

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের নষ্টামি কিছুতেই থামছে না, তাকে নিয়ে বিতর্ক চলছেই! ধারাবাহিকভাবে জেলার সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অবস্থা অস্থির করে রাখা এবং জেলাকে এক আগ্নেয়গিরি বানিয়ে তুলতে পিছপা হচ্ছে না তার দল তৃণমূল কংগ্রেস। একের পর এক সাম্প্রদায়িক এবং দ্বেষমূলক বক্তব্য রাখার মাধ্যমে মুর্শিদাবাদ জেলার সামাজিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে চলেছে এই বিধায়ক। ক্রমাগত হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করে চলেছে এই হুমায়ুন কবির। তাকে রোধ করার বা থামানোর যেন কেউ নেই! মিনি পাকিস্তানের প্রবক্তা ফিরহাদ হাকিমকে দিয়ে বোধহয় কলকাতার বাইরে মুসলমানদের মধ্যে দলের প্রভাব ধরে রাখা যাচ্ছে না। তাই চাই এক গোঁয়ার অথচ বাক্যবাগীশ কোনো মুসলমান নেতাকে। অশিক্ষিত হুমায়ুন কবিরকে তাই দলনেত্রীর ভীষণ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাকে সামনে রেখে তথাকথিত মুসলমান ভোটব্যাংককে ধরে রাখার এক মরিয়া চেষ্টায় নেমেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। আর তার এই তুঘলকি প্রচেষ্টার ফলে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ আজ এক বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে।

সামান্য এক সাইকেল মিস্ত্রি থেকে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন করে নেতা হয়ে ওঠা হুমায়ুন যেন কিছুতেই থামতে চাইছে না; অথবা বলা ভালো যে তার দল তৃণমূল এবং তার নেত্রী হুমায়ুনকে দিয়েই রাজ্যে হিন্দু-মুসলমানে গণ্ডগোল পাকিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি করতে এমনকী রাজ্যকে একেবারে পিছিয়ে দিতেও পিছপা নন! রাজ্য জুড়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়িয়ে দিচ্ছে এই হুমায়ুন কবির! অবশ্য রাজ্যের মানুষ সেটা বেশ ভালো করেই জানে। আর তাই রাজ্যজুড়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর সম্ভাবনা থাকলেও হুমায়ুন কবিরকে তোল্লা দিয়েই চলেছে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা; সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করে আছে। অধীর চৌধুরীর কংগ্রেস থেকে মমতার তৃণমূল কংগ্রেস--- দল থেকে দলান্তরে গেলেও হুমায়ুনের মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার মুখ পরিবর্তন হয়নি।

এমনিতেই মুর্শিদাবাদ জেলায় হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বিগত শতকের শুরু থেকেই। জেলায় বহিরাগত মুসলমানদের আগমন অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকেই; মুর্শিদকুলি খাঁর এই জেলায় আগমনের সময় থেকেই। নবাবদের আমন্ত্রণে মধ্য এশিয়া থেকে দলে দলে মুসলমান অভিবাসী এই জেলায় এসে বসতি গড়েছে। বিভিন্ন নবাবদের সক্রিয় সহযোগিতায় জেলায় মুসলমান জনসংখ্যা বেড়েছে হু হু করে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশভাগ পরবর্তীকালে হিন্দু উদ্বাস্তুদের এই জেলায় পুনর্বাসন দিয়ে জনবিন্যাস কিছুটা বদলানো যেত। কিন্তু প্রথমে তথাকথিত মানবতাবাদী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অন্নদাশঙ্কর রায় এবং তাঁর পরে মার্কসবাদী 'ফেলো ট্রাভেলার' ডিএম, আইসিএস অশোক মিত্রের গয়ংগচ্ছ মনোভাবের ফলে সেটা আর বাস্তবায়িত হয়ে উঠেনি। ফলে একদিকে মুসলমান জনবিস্ফোরণের কারণে, অন্যদিকে গত কয়েক দশকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের সঙ্গে মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে জেলা আজ বারুদের স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে। জনবিন্যাসের এই অসম অবস্থার কারণেই হুমায়ুন কবিরের মতো সাম্প্রদায়িক মুসলমান নেতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পেরেছে।

এই অবস্থায় জেলার সংখ্যালঘু হিন্দু চরম অস্বস্তিতে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। আর এই অবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির অস্বাভাবিক মুসলমান তোষণনীতি। তিনি মনে করছেন, রাজ্যের মুসলমান জনতাকে সন্তুষ্ট করলেই তাঁর ক্ষমতার গদি অক্ষত থাকবে। আর এই জন্য তিনি রাজ্যের বাকি ৭০ শতাংশ হিন্দুকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনছেন না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের মতো এই ৭০ শতাংশ হিন্দু জনতাকে বিভক্ত করে রাখাতেই তাঁর মনের আনন্দ! আর তাই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা মুর্শিদাবাদকেই তাঁর পরীক্ষাগার বানিয়েছেন। ফলে হুমায়ুন কবিরের মতো সাম্প্রদায়িক চুনোপুঁটি বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সাহস করে! ঘটনাক্রম থেকে এটা পরিষ্কার যে, তাঁর এই উদ্যোগের পেছনে

মুখ্যমন্ত্রীর সম্পূর্ণ সহযোগিতা আছে। নইলে এই সাম্প্রদায়িক উদ্যোগ এবং ক্রমাগত সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য কবেই হুমায়ুনকে গ্রেপ্তার করা হতো, তাঁকে এইভাবে বাড়তে দেওয়া হতো না। অথচ, মুখ্যমন্ত্রী তেমন কিছুই করেননি নেহাতই মুসলমান ভোটব্যাংকের কথা মাথায় রেখে।

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা মুখ্যমন্ত্রী এবং হুমায়ুন কবিরের মতো মানুষদের মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। তাদের মনে রাখা উচিত যে, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জনসংখ্যা কিন্তু এখনো প্রায় ৭০ শতাংশ। তাঁদের সমর্থন না পেলে তৃণমূল অথবা কোনো দলেরই পক্ষে রাজ্যের ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়। মুসলমান ভোট না পেলেও কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায়ই হিন্দুদের ভোট না পেলে কোনো দল ক্ষমতায় আসতে পারবে না। আর ব্রিটিশদের মতো চিরকাল হিন্দুদের বিভক্ত করে রাখা যাবে এমন কিন্তু নয়। অবস্থা পালটাচ্ছে। হিন্দুরাও সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। সম্প্রতি ৭ ডিসেম্বরের ব্রিগেড ময়দানে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে বিশাল জনসমাগমই সেকথা প্রমাণ করে।

হুমায়ুন কবির মসজিদ স্থাপন করতে চেয়েছেন, একজন মুসলিম হিসেবে তিনি তা করতেই পারেন। যদিও তাঁর অতীত ইতিহাস একজন হিন্দুবিদ্বেষী দাঙ্গাবাজ হিসেবেই পরিচিত। অথবা হয়তো 'সহি' ইসলামের অনুসারী তিনি। তবে শক্তিপুর, বাজারসৌ, রেজিনগর ইত্যাদি অঞ্চলে অতীতে অনেক হিন্দুবিরোধী গণ্ডগোলের মূল নায়ক এই হুমায়ুন। আর হুমায়ুন রেজিনগর-শক্তিপুর অথবা ভরতপুর অঞ্চলে মসজিদ স্থাপন না করে হঠাৎ বেলডাঙ্গায়ই বা মসজিদ স্থাপনে উঠে পড়ে লাগলেন কেন? তাও আবার আক্রমণকারী বাবরের নামে? বাবরির নামে মুসলমান আবেগকে উসকে দেওয়া? আর এইখানেই লুকিয়ে আছে মূল রহস্য! আসলে মুর্শিদাবাদ জেলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি ক্রমশ সরে যাচ্ছে; জেলার কিছু পকেটে আসাদুদ্দিন ওয়েইসির মিমের পদচারণা বেড়েছে। মমতা এতে অশনি সংকেত দেখতে পাচ্ছেন! সুতরাং মুসলমান ভাবাবেগে শান দেওয়া! আর জেলায় এই ব্যাপারে হুমায়ুনের চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি আর কে আছে! সুতরাং হুমায়ুনকে পরোক্ষে মদত দেওয়া! যদিও সাময়িকভাবে বরখাস্তের নাটকও করতে হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীকে হিন্দু ভোটের কথা ভেবে। তবে মুর্শিদাবাদের মানুষ, বিশেষকরে হিন্দুরা মুখ্যমন্ত্রীর এই নাটকবাজি ভালো করেই জানে।

এই প্রসঙ্গে কিছু কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুদের কাছে মসজিদ স্থাপন বা সেখান থেকে বার বার তারস্বরে আজান দেওয়ার বিষয়টি ভালো করেই জানা। এটা তাদের সহ্য হয়ে গেছে। তারা তাই আরও একটা মসজিদ স্থাপনে চিন্তান্বিত নয়। তাদের যেটা বিশেষভাবে ভাবাচ্ছে তা হলো, এই প্রস্তাবিত মসজিদের নাম কেন বাবরি মসজিদের নামে করা হচ্ছে? জেলা তথা রাজ্যের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উসকে দিতে হুমায়ুন ঝুলি থেকে বার করে এনেছে বিতর্কিত, সাম্প্রদায়িক, লুটেরা বাবরের নামাঙ্কিত বাবরি মসজিদের নাম! মজহব অনুশীলন করার জন্য মসজিদ স্থাপনে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু ঝুলি থেকে বাবরি মসজিদের নাম তুলে আনা থেকেই তার আসল উদ্দেশ্য বার হয়ে পড়ে। একদা বিদেশি হানাদার বাবরের সেনাপতি মির বাকি শ্রীরামচন্দ্রের স্মৃতিবিজড়িত রামমন্দির ধ্বংস করে তার ভিতের উপর গড়ে তুলেছিল বাবরি মসজিদ। আর এই মসজিদ এখন ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নিয়েছে; তার অস্তিত্ব এখন আর নেই। অতীতে এই তথাকথিত মসজিদকে কেন্দ্র করে কয়েকশো বছর ধরে হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ চলেছে। হুমায়ুন পশ্চিমবঙ্গে আবার সেই বিবাদের স্মৃতিকে অবলম্বন করে মসজিদ গড়তে চেয়ে কি ইঙ্গিত দিতে চাইছে? বাবর কি ভারতীয় মুসলমানদের পূর্বপুরুষ? আবার সামনের কয়েকশো বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান বিবাদ চলতে থাকবে? হিন্দু ধর্ম, হিন্দু ভাবাবেগকে আঘাত করে হুমায়ুন ও তার দলনেত্রী কি বোঝাতে চাইছে? ১৫২৬ সালের ভারত আর আজকের ভারত কিন্তু এক নয়! গত পাঁচশো বছরে যমুনা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে, তাকে উলটো পথে বইয়ে নিয়ে যাওয়া কিন্তু আর সম্ভব নয়! হুমায়ুন বা তার নেত্রীর কি এইটুকু ইতিহাস জ্ঞানও নেই?

বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে কয়েকশো বছর ধরে হিন্দু-মুসলমান দ্বন্দ্ব চলেছে। সেই দ্বন্দ্বের স্মৃতি এই মসজিদ স্থাপনের মাধ্যমে আবার আগামী কয়েকশো বছরের জন্য কেন উসকে দেওয়া হচ্ছে? আবার মসজিদটার অবস্থান হিসেবে ঠিক করা হয়েছে একবারে ৩৪নং (এখন ১২নং) জাতীয় সড়কে একেবারে সংলগ্ন স্থানে। সকলের মনে আছে, ধুলাগড় গণ্ডগোলের সময়ে বেশ কয়েকদিন ধরে মুম্বাই রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বেলডাঙ্গায় মসজিদ স্থাপিত হলে ভবিষ্যতে মুর্শিদাবাদ জেলার এই অঞ্চলে, ১২নং জাতীয় সড়ক যে অবরুদ্ধ হবেই একথা হলফ করে বলা যায় অথচ, কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ-সহ উত্তরবঙ্গে যোগাযোগকারী প্রধান রাস্তা এই ১২নং জাতীয় সড়ক। পুলিশ-প্রশাসনের এই বিষয়টিও মাথায় রাখা বিশেষভাবে দরকার ছিল অথচ হুমায়ুনকে গ্রেপ্তার না করে তার এই অশান্তি সৃষ্টিকারী মসজিদের ভিত্তিস্থাপন করতে দেওয়া হলো পুলিশি পাহারায়! বিস্ময়ের ব্যাপার হলো সর্বদা অতিসক্রিয় কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ও এ ব্যাপারে তাঁদের কোনো হস্তক্ষেপ করেনি। মুর্শিদাবাদ জেলার হিন্দুরা মসজিদ স্থাপনে কোনো আপত্তি জানায়নি, কিন্তু ওই মসজিদের নাম বাবরি মসজিদের নামে হওয়ায় সঠিক কারণেই তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় মনে করিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। প্রস্তাবিত মসজিদের আশপাশেই রয়েছে হিন্দুদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দির এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের বেলডাঙ্গা আশ্রম। বিন্দুবাসিনীতলা, ডুমনীতলা, শক্তিপুর, বাজারসৌ ইত্যাদি স্থানে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধদের বেশ কয়েকটি মন্দির। এই মসজিদ স্থাপন নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো করে তুলবে।

এই অবস্থায় মুর্শিদাবাদ জেলার সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে হিন্দুরা বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ স্থাপনের বিরোধী। তাই রাজ্য প্রশাসনের উচিত, কোনো অবস্থাতেই বেলডাঙ্গায় বাবরের নামাঙ্কিত মসজিদ নির্মাণ করতে না দেওয়া, এই প্রচেষ্টা আটকে দেওয়া। মুঘল যুগে তাদের শাসিত অঞ্চল জুড়ে কোনো নতুন হিন্দু মন্দির স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল, পুরানো মন্দির ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমান অবস্থায় হয়তো সেটাই একমাত্র বিকল্প হতে পারে। নতুন মসজিদ নির্মাণ, বিশেষ করে কোনো প্রধান সড়কসংলগ্ন অঞ্চলে, নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত যাতে ভবিষ্যতে সেটা গণ্ডগোলের কেন্দ্র না হয়ে উঠে। □

মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ কি ইসলামি আবেগ না কোনো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা?

১৯০৬-এ ঢাকায় মুসলিম লিগ তৈরির দিন থেকেই, বাংলাভাষী মুসলমান এলিট, অর্থাৎ বড়ো জমিদার, নবাব, নাইট উপাধিধারী এবং পীরজাদাদের উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গের দখল নেওয়া। ঐতিহাসিকভাবে এটি প্রমাণিত যে, বঙ্গের ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারত বাঙ্গলার ওপর নির্ভরশীল। ইংরেজদের পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরি হওয়া মুসলিম লিগ প্রথম থেকেই ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলে এবং তাদের দোসর হয় হিন্দু নামধারী কিছু কমিউনিস্ট নেতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজরা যখন ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে বিভিন্ন ফর্মুলা তৈরি করা শুরু করে, তখন দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাদেশিক আইনসভা। বঙ্গপ্রদেশে ১৯৩৭, '৪২ ও '৪৬-এর ভোটে নির্বাচিত হন তিনজন মুসলমান প্রিমিয়ার (প্রধানমন্ত্রী)। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা থেকে একটিও আসন পায়নি কংগ্রেস। এটা প্রমাণ করে বাংলাভাষী মুসলমানরা সেই সময় থেকেই রাজনৈতিকভাবে কতটা সচেতন এবং হিন্দু বাঙ্গালিদের সম্পর্কে তাদের মনোভাব কী। ১৯৪২ ও '৪৬-এর মুসলিম লিগ প্রধানমন্ত্রীদের আমলে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো বিশ্বের ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভিক্ষ (বেঙ্গল ফেমিন) এবং ১৯৪৬-এর হিন্দু গণহত্যা। হিন্দু বাঙ্গালিদের এক অংশকে সঙ্গে নিয়ে মুসলিম লিগের পক্ষ থেকে দুর্ভিক্ষর পুরো দায় চাপিয়ে দেওয়া হয় ব্রিটিশদের ওপর। তৎকালীন সংবাদপত্র, শিক্ষক, ইতিহাসবিদ, অর্থনীতিবিদ সবাই ছাড় দেন বঙ্গের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনকে। প্রথম প্রশ্ন হলো, যদি ব্রিটিশ অপশাসনই এই দুর্ভিক্ষের কারণ হয়, তবে ভারতের অন্যান্য অংশে এই দুর্ভিক্ষ হয়নি কেন? এমনকী রাজপরিবারের অধীন রাজ্য কোচবিহার ও ত্রিপুরায় এই দুর্ভিক্ষ হলো না কেন? দ্বিতীয়ত, লক্ষণীয় বিষয় হলো ১৯৪৬-এ কলকাতা ও নোয়াখালিতে হিন্দু নরসংহার। এখানে মনে রাখতে হবে হিন্দু ও শিখদের ওপর আক্রমণ পঞ্জাবেও হয়েছে, কিন্তু সেটা দেশভাগের পরে। দেশভাগের আগে হিন্দু নরসংহার হয়েছে শুধুমাত্র বঙ্গেপ্রদেশে এবং সেটা করিয়েছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দি। উদ্দেশ্য— কংগ্রেস ও ব্রিটিশকে দেশভাগে বাধ্য করার জন্য ব্ল্যাকমেল। এক্ষেত্রেও মুসলিম লিগ এমন জনসংযোগ গড়ে তোলে যে, এই গণহত্যাকে 'দাঙ্গা' বলে চালিয়ে দেওয়া হয় এবং আজকের ৯৯.৯৯ শতাংশ বাঙ্গালি জানেই না যে, সেই সময় বেঙ্গল প্রভিন্সের প্রশাসন চালিয়েছে মুসলিম লিগ সরকার। বঙ্গ জুড়ে দুর্ভিক্ষ এবং হিন্দুদের সুরক্ষাহীনতায় ব্রিটিশ প্রশাসনের ভূমিকা থাকলেও সেই সময় ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকারের যাবতীয় কুকর্মকে তুলে ধরার কাজটি স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা। অতএব, ১৯৪৭-পূর্ববর্তী পর্যায়ে তিনটি বিষয় লক্ষণীয়। (১) বাংলাভাষী মুসলমানদের নির্বাচনী রাজনীতি সম্পর্কে সচেতনতা। (২) বাঙ্গলায় ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগ সরকারের কুশাসন। (৩) কুশাসনকে প্রচারের বাইরে রাখতে জনসংযোগের নানা কৌশল ব্যবহার করে মুসলিম লিগের হাত ধুয়ে ফেলা।

ভারত কেশরী ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কংগ্রেসের একটা বড়ো হিন্দু বাঙ্গালি অংশের জন্য স্বাধীনতা পরবর্তী পর্যায়ে 'পশ্চিমবঙ্গ' পেল বাঙ্গালি। কিন্তু পঞ্জাবের মতো এখানে হলো না জনসংখ্যা বিনিময়। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানরা একে অপরের দেশে গেল না। কোচবিহার, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, নদীয়াতে থেকে গেল বাংলাভাষী মুসলমানরা। কিন্তু দেশ বিভাজনের পরেই পূর্ব পাকিস্তান থেকে হিন্দু বিতাড়ন শুরু হলো। অর্থাৎ এপার বঙ্গে মুসলমানদের সম্পত্তি থেকে গেলেও ওপার বঙ্গে হিন্দু সম্পত্তি দখল হয়ে গেল। ১৯৫০ সালে বরিশালে হিন্দু গণহত্যা এবং তারপর তথাকথিত ভাষা আন্দোলনের পর নেহরু চুক্তি করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের সঙ্গে। উদ্দেশ্য ছিল— দুই দেশের সংখ্যালঘুদের রক্ষা। কিন্তু সংখ্যালঘু নির্যাতনের সমস্যা তো ভারতে ছিল না। এই সমস্যা ছিল পাকিস্তানে। ভারত এই চুক্তি মেনে চললেও, হিন্দুদের ওপর ভয়াবহ অত্যাচার চলতে থাকে পূর্ব পাকিস্তানে।

এদিকে নেহরু ভারতে শুরু করলেন জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ। সঙ্গ দিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। ভূমি সংস্কার আইন হলো, কিন্তু তা প্রযোজ্য হলো হিন্দু জমিদারদের ওপর। মুসলমান জমিদারদের কেউ উৎখাত হলো না। যেমন মালদহের গনি খান চৌধুরীর পরিবার, বা দিনাজপুরের আবদুল করিম চৌধুরীর পরিবার। স্বাধীনতার পর মালদহ, মুর্শিদাবাদের ভোটাররা মোটামুটি কংগ্রেসের ভোটার হয়ে যায়। মালদহ লোকসভা গনি খানকে ছেড়ে দিলেও বিধানসভায় হিন্দু প্রার্থী দিত কংগ্রেস যাতে মালদহের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে না যায়। মুর্শিদাবাদে লোকসভা ও বিধানসভা— দুই ক্ষেত্রেই কংগ্রেস ও বামেরা হিন্দুদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা রাখে, যাতে হাতের বাইরে চলে না যায় মুর্শিদাবাদ। এর পিছনে স্ট্র্যাটেজিক কারণও রয়েছে। মুর্শিদাবাদে গঙ্গা দু'ভাগে ভাগ হচ্ছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব ভারতকে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হলে মুর্শিদাবাদের নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতে থাকা দরকার। এই জেলাটি পাকিস্তান বা বাংলাদেশে গেলে চলবে না। কিন্তু মালদহ-মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে মুসলমান নেতৃত্বকে সামনে এনে জেলা দু'টির নিয়ন্ত্রণ হাতের বাইরে ছেড়ে দেওয়া শুরু করেন তৃণমূলনেত্রী। তার দৌলতে মালদহ-মুর্শিদাবাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা আজ বাংলা ও উর্দুভাষী মুসলমানদের হাতের মুঠোয়। এমতাবস্থায় জেলাগুলির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিতে মালদহে মিম এবং মুর্শিদাবাদে হুমায়ুন কবির মাঠে নেমে পড়েছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কট্টর ইসলামি শাসন কায়েম করতে আজ এই বাবরি মসজিদের ঘোষণা। এই লক্ষ্যে বহুদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিল জেহাদিরা এবং তার রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষায় সেই সব আবদার মেনেও নিচ্ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ২০১৯ সালে সিএএ বিরোধী আন্দোলনে রেললাইন উপড়ে ফেলা, রেল স্টেশন ধ্বংস, ২০২৪ সালে বেলডাঙ্গায় কার্তিক পূজায় হিন্দুদের ওপর আক্রমণ, ২০২৫ সালে দুর্গাপূজার আগে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের হত্যার মাধ্যমে জল মেপেছে জেহাদিরা। ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় হাজার হাজার হিন্দু তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। জেলার পরিস্থিতি এখন মুখ্যমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ যদি রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে কট্টর জেহাদি শক্তির হাতে চলে যায়, তবে আগামীদিনে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্ব ভারত। এই দুই জেলা ছাড়াও কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলী, নদীয়াতে ১৫ বছরের কম বয়সীদের জনসংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে হিন্দুরা আজ এই জেলাগুলিতে সংখ্যালঘু। ফলে জেহাদিদের কলকাতা দখল সময়ের অপেক্ষা। জেহাদিদের চাপে কলকাতায় মুসলমান মেয়র আগে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। বাবরি রাজনীতি ভারতে এক নতুন কাশ্মীর তৈরি করছে। আগামীদিনে কলকাতা হয়তো শ্রীনগরে পরিণত হতে পারে। ঘর পোড়া গোরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, কিন্তু হিন্দু বাঙ্গালির বড়ো অংশের সেই চেতনাও নেই। তাই বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পরেও অধিকাংশ বাঙ্গালি নির্বাক ও নির্বিকার। □

‘খেলা হবে’র খেলায় হেরে যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ

বিপ্লব বিকাশ

‘খেলা হবে। খেলা হবে। খেলা, খেলা, খেলা হবে!’—এই গান ও স্লোগানটি ২০২১-এর পর রাজ্য জুড়ে ভালোই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দলের অফিশিয়াল গান হিসেবে এটিকে গ্রহণ করে। সত্যিই, তৃণমূল জমানায় রাজ্য জুড়ে ‘খেলা’ই তো হচ্ছে। রাজ্যের মানুষের মন নিয়ে খেলা, তাঁদের জীবন-জীবিকা নিয়ে খেলা, তাঁদের আবেগ নিয়ে খেলা, রুজি-রোজগার-জমি- ভিটেমাটি নিয়ে খেলা, শিক্ষিত যুবকদের সঙ্গে খেলা, অত্যাচারিত মহিলাদের ন্যায়বিচার নিয়ে খেলা!... সত্যিই তো মানতে হবে যে, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে খেলা হচ্ছে। কিন্তু খেলছে কে? এই খেলোয়াড়ের খেলাটা এখন আর শুধু রাজনীতির গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। এটা এখন প্রশাসন, সরকারি নীতি এবং সর্বোপরি লজ্জার খেলায় পর্যবসিত হয়েছে। এই সময় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন জাগে, এই খেলা কি রাজ্যবাসীর জন্য, নাকি এটা রাজ্যের ইতিহাস-সংস্কৃতি-পরম্পরা-ঐতিহ্য ও ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলা? গত ১৩ ডিসেম্বর কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যে ভয়ংকর দৃশ্য দেখা গেল, তা রাজ্যের সাধারণ মানুষের মনে ক্ষোভের আগুন জ্বেলে দিয়েছে। আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লিওনেল মেসি কলকাতায় আসবেন, এ খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজনায় ফুটছিল শহর। ছাত্র-ছাত্রী, মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে ফুটবল নিয়ে আবেগপ্রবণ বাঙ্গালি। বর্তমান বিশ্ব ফুটবলের মহানায়ক মেসিকে দর্শনের জন্য বাঙ্গালি ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে জনজোয়ার দেখা যায়। কিন্তু ‘মেসি’-দর্শনের জন্য যে ‘ইভেন্ট’ আয়োজিত হয়, সেটার জন্য নির্ধারিত টিকিটের দাম ছিল প্রায় সোনার দামের মতো। ব্ল্যাক-হোয়াইটে টিকিট কেনাবেচার ক্ষেত্রে আলাদা মূল্যও ছিল। কোনো কলেজ ছাত্র পুরো মাস রাতে র‍্যাপিডো চালিয়ে টাকা জোগাড় করে টিকিট কিনেছিল, তো কেউ ধার নিয়ে বা নিজের কষ্টার্জিত টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছিলেন। কিন্তু যখন মেসি-দর্শনের সুযোগ পাওয়ার কথা, সে সময় উত্তেজনার মাঝেই এক অদ্ভুত ‘খেলা’ শুরু হয়ে গেল। মন্ত্রী, আমলারা, তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন— মাঠের মধ্যে ঢুকে মেসিকে কেন্দ্র করে সবাই যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন একটাই উদ্দেশ্যে— ‘মেসির সঙ্গে একটা সেলফি!’ মেসিকে একবার মাত্র একটু কাছ থেকে দেখার আশায় যে ফুটবলপ্রেমীরা যুবভারতীতে গিয়েছিলেন, তারা কেউ আর মেসিকে দেখতে পেলেন না। মাঠে ঢুকে কম সময় থেকে চূড়ান্ত অব্যবস্থা দেখে তৎক্ষণাৎ মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন মেসি। এরপর যুবভারতী জুড়ে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি, ভাঙচুর সবই চলল। কলকাতার অনুষ্ঠান বাতিল করে তেলেঙ্গানায় ভাগ্যনগরে চলে যান মেসি। এই ঘটনাটি শুধু প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয়; এটি একটি জঘন্য মানসিকতার প্রতিফলন। যেখানে ক্ষমতার অহংকার এতটা বেড়ে গিয়েছে যে, একজন মন্ত্রী, রাজ্যের ক্রীড়া দপ্তরের একজন আধিকারিক বা শাসক দলের বড়ো, মেজ, ছোটো নেতারা ভাবেন যে, ‘আমার সেলফি, আমার গৌরব!’ জনগণের স্বার্থের চেয়েও সেটাই যেন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আসল খেলোয়াড় বা ক্রীড়াবিদ কে? যিনি মাঠে ঘাম ঝরান, না যিনি ভিআইপি লাউঞ্জে বসে বা মাঠে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন?

‘খেলা’র নাম দিয়ে এই রাজ্যে অনেক কিছুই হয়। মানুষের আশা নিয়ে খেলা হয়, ভোটের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়ে খেলা হয়, নির্বাচনের পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলি ভুলে গিয়ে খেলা হয়। এখন দেখা যাচ্ছে যে, সেই খেলার মঞ্চ আর শুধু রাজনীতি নয়, সেটা এখন সংস্কৃতি, ক্রীড়া, এমনকী আত্মসম্মানের পরিসরেও ছড়িয়ে পড়েছে। মেসির মতো একজন বিশ্বতারকা যখন কলকাতায় আসেন, তখন তা শুধুমাত্র কলকাতা নয়, গোটা রাজ্যের গর্বের বিষয় হওয়ার কথা। কিন্তু এই ‘খেলাধুলা’ এবার এমন পর্যায়ে নেমে গেল, যে তা আন্তর্জাতিক স্তরে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ালো। এক সময় যে রাজ্যে খেলার মাঠ ছিল ক্রীড়া প্রতিভার জন্মভূমি, সেই মাঠ এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনীর জায়গা। সবচেয়ে দুঃখজনক বিষয় হলো, মুখ্যমন্ত্রী— যিনি এই রাজ্যের মুখ, রাজ্যবাসীর প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনিও যেন এই অরাজকতা এবং প্রশাসনিক ব্যর্থতার সামনে অসহায় হয়ে পড়লেন। ফুটবলপ্রেমী জনগণের ক্ষোভ, কটূক্তি, প্রতিবাদের মুখে পড়ে তাকেও হয়তো পথ পরিবর্তন করতে হলো। তিনি নাকি যুবভারতীর দিকেই আসছিলেন। গণ্ডগোলের খবর পেয়ে মাঝপথেই ঘুরে যায় তার কনভয়। কিন্তু এটা তার রাজনৈতিক ইমেজের ক্ষতি নয়; এটা গোটা রাজ্যের সম্মানের প্রশ্ন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী তো এক্স হ্যান্ডলে ট্যুইট করে ক্ষমা চাইলেন, এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করলেন। তদন্তের ঘোষণাও হলো। আয়োজকের গ্রেপ্তারিও হয়েছে। আয়োজক শতদ্রু দত্ত গ্রেপ্তার হলেও কিন্তু শাসক দলের এই ‘খেলা’র বিভিন্ন রূপ নিয়ে চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পানের গুমটি হোক বা অফিস পাড়ার আড্ডা হোক— সর্বত্র তুমুল আলোচনা চলছে। অনেকে বলছেন যে, এই ‘ইভেন্ট’ আয়োজনের মাধ্যমে ২০২৬-এর ভোটে লড়ার ফান্ড জোগাড় করল রাজ্যের শাসক দল। ৪ হাজার থেকে শুরু করে ৪০ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে এই ইভেন্টের টিকিট। ২০ টাকার জলের বোতল মাঠের মধ্যে বিক্রি হয়েছে ১২০ টাকায়। মেসির সঙ্গে করমর্দন এবং তাঁর সঙ্গে ছবি তোলার জন্য ইভেন্টের উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ব্যক্তিপিছু ১০ লক্ষ টাকা। এই কোটি-কোটি টাকা যাদের থেকে নেওয়া হলো, সেই ক্রীড়াপ্রেমীদের কি সেই অর্থ ফেরত দেওয়া হবে? এই পরিমাণ অর্থ আদৌ ফেরত দেওয়া সম্ভব কি? অনেকে প্রশ্ন করছেন যে, ক্রীড়াপ্রেমীদের থেকে সংগৃহীত এই অর্থের অঙ্ক বিজ্ঞাপনদাতাদের থেকে নেওয়া অর্থের অঙ্কের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র। বিজ্ঞাপনের জন্য বিজ্ঞাপনদাতাদের দেওয়া টাকার কী হবে? এইরকম একটি হাই-প্রোফাইল ইভেন্ট আয়োজনের ক্ষেত্রে ‘ক্রাউড ফান্ডিং’-এর পন্থা অবলম্বন করে ইভেন্টটির সঙ্গে প্রথমেই ‘খেলা’ করে দেওয়া হয়নি তো? সত্যিটা কী সেটা জানা হয়তো মুশকিল! এই ঘটনার পর কেউ কেউ হয়তো বলবেন— এটাতো একটা ছোটো ব্যাপার, সামান্য কিছু গণ্ডগোল হয়েছিল, যেটা স্টেডিয়ামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এতে রাজ্যের মুখ পোড়ার কী আছে? সত্যিটা হলো, এই ‘গণ্ডগোল’ বা অরাজকতাটাই হলো রাজ্যের আসল চিত্র। আজ যেন এটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রাজ্যের মানসিকতার আয়না, যেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ববোধের জায়গাটি নিয়েছে অহংকার; পরিষেবা প্রদানের জায়গাটি নিয়েছে প্রভাব ও ক্ষমতা প্রদর্শন। আজ প্রশ্নটা তাই সহজ-সরল; ‘খেলা হবে’ বললে, সেই খেলাটা আসলে কীসের? ক্রীড়াপ্রেমীদের মনোরঞ্জনের বিষয় না হয়ে যদি এই ‘খেলা’ হয় রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখানোর; মানুষের ভোটে জিতে এসে সেই মানুষকেই ভুলে যাওয়ার, তাহলে এই ‘খেলা’য় জিতবে না কেউই। শাসক দলের সঙ্গে এখানে হারবে একটি রাজ্য, একটি সমাজ ও একটি প্রজন্ম। ▫

গল্পকথায় ডাক্তারজী

(৫০)

প্রকৃত শক্তিকেন্দ্র

সঙ্ঘে প্রতি বছর বিজয়া দশমী উৎসব পালনের সময় শস্ত্র পূজন করার প্রথা আছে। যেখানে লোহার তরোয়াল, কাঠের ছুরিকা ইত্যাদি প্রতীকী শস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়। একবার কয়েকজন পঞ্জাবী ব্যবসায়ী ওয়ার্ধায় প্রকৃত ইস্পাতের তরবারি ছুরিকা সমস্ত বিক্রি করতে এলে স্থানীয় কার্যবাহ শ্রীবুরাণ্ডের খুব ইচ্ছা হলো সেগুলি কিনে নিলে 'শস্ত্রপূজন' অনুষ্ঠানে কমপক্ষে আসল দু-একটা জিনিস রাখা যাবে। দাম ইত্যাদি জেনে নিয়ে তিনি সেখানকার সঙ্ঘচালকজীর কাছে গেলেন অনুমতি নেওয়ার উদ্দেশ্যে। ঘটনা চক্রে সে সময় ডাক্তারজীও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বিষয়টি তার সামনে উপস্থাপিত হলে তিনি শ্রীবুরাণ্ডেকে জিজ্ঞেস করলেন— 'আচ্ছা, আমাদের সমাজ উত্তমরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও পরাধীন হলো কেন?' নিজেই উত্তর দিলেন— 'সমস্ত অন্তঃকরণকে রাষ্ট্রনিষ্ঠ করে তোলার। এইরকম অন্তঃকরণ সমস্ত দেশে নির্মাণ হবার পরে তাদের হাতে উপকরণ নিজে থেকেই চলে আসবে'।

এই কারণেই এ সময়ে ডাক্তারজী অতি সন্তপর্ণে একটি কর্তব্য পালন করে চলছিলেন। বিপ্লবী কাজের সময় নাগপুর ও ওয়ার্ধা জেলার বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে রাখা অস্ত্র-শস্ত্র নাগপুরে নিয়ে এসে জমা করতে লাগলেন। তিনি অত্যন্ত নিবিড় ভাবে সজাগ থাকতেন সরকার যেন এ বিষয়ে ঘুণাক্ষরে টের না পায় এবং এইগুলো কোনো স্বয়ংসেবকের হাতে না পড়ে। অস্ত্র-শস্ত্রের উপরে তাঁর কোনো বিরূপতা ছিল না, কিন্তু তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, ইংরেজদের চোখের সামনে হিন্দু রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে এক অভেদ্য সংগঠন গড়ে তুলতে হলে তার প্রয়োজনীয় পথ্যাপথ্য অবশ্যই চাই। তিনি জানতেন যে যতক্ষণ দেশবাসীর অন্তঃকরণ জ্বলন্ত রাষ্ট্রভক্তিতে পরিপূর্ণ রয়েছে, ততক্ষণ এই সংগঠন গড়ে তোলার সব রকম আশা থাকবে।

(৫১)

সংকট মোচন (১)

গোরক্ষা ও গো সংবর্ধনের বিষয়ে ডাক্তারজী চিরকালই অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। সে কারণে শ্রী গোপালরাও ভিড়ের 'গোরক্ষণ সভা'র জন্মকাল থেকেই সহযোগী রূপে তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রতিককালে দাঙ্গার মানসিকতায় মুসলমানরা গত ঘটনা সমূহের কারণে কিছুটা দুর্বল হলেও তারা উপদ্রব করতে পারে বলে মাঝে মাঝেই গুজব রটতো। এরকম অবস্থায় গো-শোভাযাত্রা কতটা সঙ্গত বা নিরাপদ হবে আবার এরকম গণ্ডগোল হবে কিনা এই আশঙ্কা জাগায় শ্রী চৌণ্ডে মহারাজ ডাক্তারজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখে গেছেন— ''হিন্দুত্বে পরিপূর্ণ ডাক্তারজীকে দর্শন করামাত্র আমি 'নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব' বলে সব বৃত্তান্ত তার কাছে নিবেদন করলাম। হিন্দুস্থানে গোমাতার কাজে বিঘ্ন হবে কেমন করে? এই কথা বলে সরসঙ্ঘচালকজী তাঁর এক কার্যকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকে যা সূচনা দেওয়ার তা তার নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি দিলেন। আমি শোভাযাত্রায় থাকবো কিছু চিন্তা করবেন না, বলে তিনি আমাদের বিদায় জানালেন। ডাঃ মুঞ্জে ও আমি নিজ নিজ স্থানে চলে গেলাম। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শ্রীরামমন্দিরের সামনে ডাঃ হেডগেওয়ারের রাম সেনা কয়েক হাজার সংখ্যায় সমবেত থাকতে দেখে আমার তো ম্যাজিকের মতো মনে হলো। বলাবাহুল্য শোভাযাত্রায় আর কোনো অসুবিধা হয়নি।'' কতটা রাষ্ট্রভক্তি, অনুশাসন ও যোজনাবদ্ধতা থাকলে সংগঠন শক্তিশালী হয়ে ওঠে ডাক্তারজীর এই ঘটনা থেকে তা অনুমান করা যায়।

সংকলক : বিমলকৃষ্ণ দাস